ত্রৈমাসিক

জেনে চলবো, ভালো থাকবো   সুস্থ থাকবো, সুস্থ রাখবো

আমার স্বাস্থ্য

১ম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ মাঘ ১৪২৫ ■ ডিসেম্বর ২০১৮ ⬟ হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার এর একটি প্রকাশনা

হৃদয় ভালো আছে তো??

চিনি খেলে ডায়াবেটিস হয়?

ভ্যাক্সিন-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

অটিজম কি?

এখনকার নারীরা অনেক এগিয়েছে, সবাই কিছু না কিছু করছে। নারী শিক্ষার হারও বেড়েছে। বেড়েছে সচেতনতাও, এখন সমস্যা হলো পুষ্টিজ্ঞানের।

—জাতীয় অধ্যাপক ডা: শাহলা খাতুন

• বিশেষ: প্রাণঘাতী ভাইরাস • ক্যান্সার থাবার কবলে • পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষার্থে প্লাস্টিককে 'না' বলি এবং পাটকে 'হ্যাঁ' বলি

BEXIMCO REAL ESTATE

বেক্সিমকো রিয়েল এস্টেট ডিভিশন

ঢাকা অফিস:

চট্টগ্রাম অফিস:

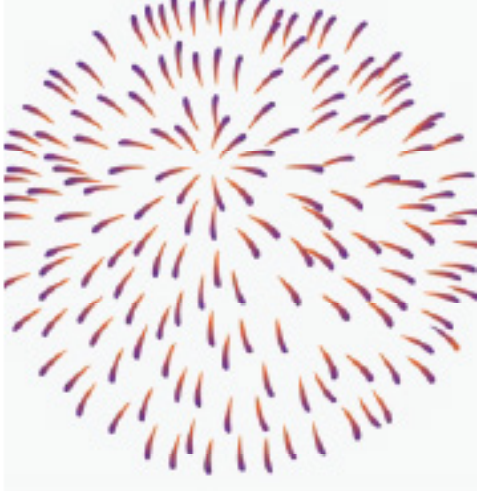

দৈনিক আমার স্বাস্থ্য

এর সম্মানিত লেখক, পাঠক, কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নতুন বছরের

শুভ কামনা ও কৃতজ্ঞতা

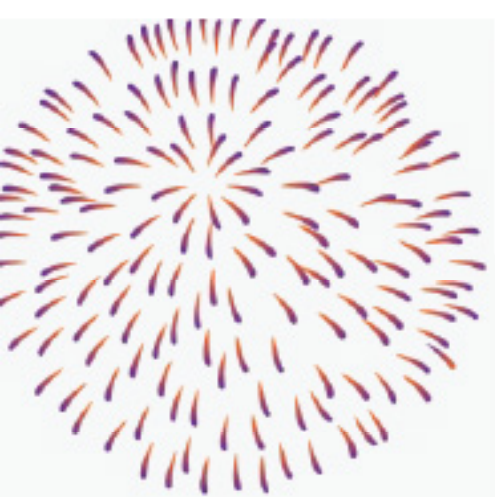

2019

Happy New Year

সম্পাদকের টেবিল থেকে

‘আমার স্বাস্থ্য’ স্বাস্থ্যপরিচর্যা বিষয়ক ম্যাগাজিনের সম্মানিত পাঠক, লেখক, কলাকুশলী ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

‘আমার স্বাস্থ্য’ ম্যাগাজিনের তৃতীয় সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌছে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

উন্নত বিশ্বে হৃদরোগ মৃত্যুর প্রথম ৩টি কারণের মধ্যে অন্যতম। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের দেশেও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো হৃদরোগ কোন লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ বিপর্যয় হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

সুষম খাদ্যাভ্যাস, জীবন যাপনের যথাযথ পদ্ধতি এবং পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। আধুনিক জীবনযাত্রার রীতি, শারীরিক শ্রমের অনীহা এবং সর্বোপরি মানসিক ও শারীরিক চাপ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হৃদরোগের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এ কারণেই জীবনযাত্রার অগ্রগতির পাশাপাশি হৃদরোগের হারও বেড়ে চলছে।

সাঁতার কাটা অত্যন্ত ভালো ব্যায়াম। তাছাড়া সাইকেল চালানোও হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো। প্রতিদিন অন্ততঃ ৩০ মিনিট দ্রুত হাটা হৃৎপিণ্ডের জন্য ভালো। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শারীরিক শ্রম বা ব্যায়াম করা উচিত।

ধূমপান হৃদরোগের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সুতরাং, হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে ধূমপান ত্যাগ করার বিকল্প নেই। মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ বা বিষন্নতা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

আপনাদের সবার হৃদয় ভালো থাকুক- এ প্রত্যাশা করছি।
এই শীতে আপনাদের সবার জন্য রইলো উষ্ণ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।
সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আইভি খান ওয়াহিদ

আইভি খান ওয়াহিদ

সূচিপত্র

বর্ষঃ ০১, সংখ্যাঃ ০৩, মাঘ, ১৪২৫, ডিসেম্বর ২০১৮

মূল্যঃ ৫০ টাকা।

ত্রৈমাসিক
আমার স্বাস্থ্য
জেনে চলবো, ভালো থাকবো বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবো

বাড়ী নং #২১, রোড নং #১২, পুরাতন (৩১)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
ফোনঃ +৮৮ ০১৭৪৮ ৩৪৮৬২১
ইমেইলঃ hhhealth2015@gmail.com

উপদেষ্টা পর্ষদ
অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আক্তার
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুর রহিম
মেজর (অবঃ) পারভেজ হাসান, পি.এস.সি

সম্পাদক
আইভি খান ওয়াহিদ

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ শাকিল তানভির

সহ সম্পাদক
ডাঃ শায়লা আজিজ
ডাঃ রোখসানা আফরোজ
ডাঃ আসিফ ইয়াজদানী

গ্রাফিক ডিজাইনার
প্রিয়াংকা প্রিয়া

"আমার স্বাস্থ্য" হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ম্যাগাজিন।

কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

হৃদয় ভালো আছে তো?? ০৬
চিনি খেলে কি ডায়াবেটিস হয়? ১৩
ভ্যাক্সিন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ১৬
৬ ঘণ্টার কম সময় ঘুমালে শরীরের একাধিক ক্ষতি হয়। ২১
ঝটপট ওজন কমাতে চান? তাহলে পান করুন এই জাদুকরী ২ টি পানীয় ২৫
প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মটরশুটি কেন রাখবেন ২৭
শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করবে যে খাবার ২৮
যে খাবার আপনার লিভারকে সুস্থ রাখবে ৩০
রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা দূর করবে কাঁচাকলা ৩৩
যে স্বাস্থ্য সমস্যায় কলা ঔষধের চেয়েও ভালো ৩৪
সর্দিকাশি ৩৭
মস্তিষ্কের ওপর অদ্ভুত প্রভাব রাখতে পারে আদা ৪০
শীতে যে ৫ টক ফল অবশ্যই খাবেন ৪৩
নিপাহ: প্রাণঘাতী ভাইরাস ৪৫
পেশীর টান থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন ৪৭
ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট : কী করা উচিত ৪৮
মিথ্যে বলার অভ্যাস থেকে বাচ্চাকে বাঁচানোর রাস্তা ৫০
ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর কারণে যে যে ক্ষতি হয় ৫৩
বাচ্চার শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা নির্ধারণ করে! ৫৫
পিঠ ও কোমর ব্যথা কমানোর সেরা পানীয় ৫৭
দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ৫৯
জাতীয় অধ্যাপক ডা: শাহলা খাতুন ৬১
চোখ ভালো রাখতে কী করবেন? ৭৩
শীতে মুখ চালাতে থাকুন এই ড্রাই ফ্রুটগুলি দিয়ে ৭৫
জিভের রং দেখে শরীর বুঝুন ৭৮
ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ৮০
অটিজম ৮৪
পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্লাস্টিককে 'না' বলি এবং পাটকে 'হাঁ' বলি ৯০

ছবি: ইন্টারনেট

হৃদয় ভালো আছে তো??

আমি একটি প্রশিক্ষন কর্মশালায় ক্লাস করছিলাম। মোবাইল এর রিংটোন বন্ধ করা, নোটিফিকেশনের হালকা আওয়াজ শুনে ফোন হাতে নিয়ে দেখি এস এম এস, ওপেন করে দেখলাম, মৃত্যু সংবাদ! আমার খুব কাছের এক জুনিয়র বন্ধুর বাবা মারা গেছেন হঠাৎ করেই। ৬ দিন আগে শুনেছিলাম আমার বন্ধুর বড় ভাইয়ের বিয়ে। ওর বাবা অসুস্থ ছিল জানতাম না তো! কর্মশালা শেষ করে বেরিয়ে ফোন দিয়ে শুনলাম- সন্ধ্যা হতেই নাকি বলছিলেন এ্যাসিডিটি হচ্ছে। রাতে ভাতও খান নাই, ৯/১০ টার দিকে নাকি এক গ্লাস দুধ খেয়েছিলেন এই যা। রাতে ১১/১১:৩০ টার দিকে ঘুমাতে গেলেন। এর মাঝে গ্যাসট্রিকের ঔষধও খাওয়া শেষ। ঘুমাবার ঘন্টাখানেক পর ঘুম থেকে ডেকে তুলেন খালাম্মাকে- বললেন খারাপ লাগছে, কেমন যেন লাগছে। খালাম্মা ইনো গুলে দিলেন। খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন । কিছুক্ষন পর আবার খালাম্মাকে ডেকে তুললেন- বললেন খুব অস্থির লাগছে বাতাস করতে - এর মধ্যে ফজরের সময় হয়েছে। ফজরের কিছু পর শ্বাস ঘন ঘন পড়তে লাগলো মানে শ্বাস কষ্ট শুরুর মুহুর্তের মধ্যেই কিছু করার আগেই চলে গেছেন । কথা বলে জানলাম ৬ মাস আগে চেকআপ করেছিলেন তেমন কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি। যথাবিহিত ডায়াবেটিস, বাকি সব ঠিক ছিল। তার ডায়াবেটিস ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতেন না । তবে ধূমপানের বদঅভ্যাস ছিল। খালাম্মা জানালেন বুক ব্যথা হচ্ছে এমনটি বলেন নাই। বুকে চাপ চাপ অনুভব করছিলেন আর ছিল অস্থিরতা। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার পর মৃত ঘোষনা করলেন, কারণ কার্ডিয়াক অ্যারেষ্ট।

এতে অনেক সময় রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করেন না কিন্তু এ্যাটাক ঠিকই হয়। ডাক্তারদের মতে, যাদের ডায়াবেটিস আছে সে সাথে মাত্রারিক্ত ধূমপানের অভ্যাস হার্ট এ্যাটাকের কারণ হতে পারে। খালুর মাত্রাতিরিক্ত ধূমপানের অভ্যাস ছিল। খুব যে বয়স হয়েছিল তা নয়। বড় সন্তানের বয়স বর্তমানে ৪১ বছর।

প্রচ্ছদ

দেশে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। চিকিৎসার উন্নয়নও হচ্ছে আবার রোগের জটিলতাও বাড়ছে ক্রমশই বিশেষ করে হৃদরোগ সম্পর্কিত। ৫০-৬০ উর্ধ্ব মানুষের মধ্যে আজকাল হার্টের ব্লক সহ অন্যান্য রোগের আশংকা বেড়েই যাচ্ছে। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণসমূহ জানেনা কিংবা জানেন না ঐ মুহূর্তে কি করতে হয়।

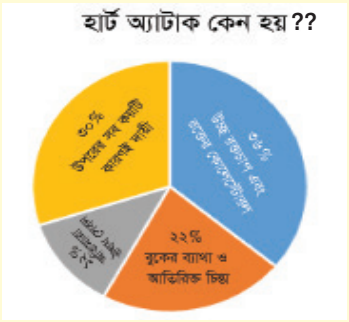

স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন "আমার স্বাস্থ্য" কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে হার্ট অ্যাটাক কেন হয় প্রশ্নের উত্তরে ৩৬% মানুষ বলেছেন এর কারণ, উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তের কোলেস্টেরল। আবার ২২% মনে করেন বুকের ব্যাথা ও অতিরিক্ত চিন্তার কারণেই হার্ট অ্যাটাক হয়। ১২% মনে করে অতিমাত্রা ঔষধ সেবনের কারণে , আর ৩০% মনে করেন হার্ট অ্যাটাকের জন্য উপরের সব কয়টি কারণই দায়ী। এক্ষেত্রে সচেতনতা খুবই জরুরী। হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে অন্যতম বিষয় হলো রক্তে কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা। কিন্তু কিভাবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৪% মানুষ বলেছেন দৈনিক হালকা ব্যায়াম, জোরে হাঁটা বা দৌড়ানো কমপক্ষে আধা ঘণ্টা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহার এবং আঁশ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ও শাকসবজি খাওয়া, আবার ২৮% মানুষ বলেছেন ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। ১০% বলেছেন খাদ্যে লবণের পরিমান কমানো আর ৩১% মানুষ মনে করে রক্তের কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সত্যিকার অর্থে এসবই করা জরুরী। কারণ সব কোলেস্টেরলই শরীরের জন্য খারাপ এমন নয়। যেমন জরিপকৃত ৪১% মানুষ বলেছেন এইচ. ডি.এল. কোলেস্টেরল, HDL(high density lipoprotein) এটি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় আর ক্ষতিকর কোলেস্টেরল হলো **LDL-low density lipoprotein** । তাই আমাদের উচিত রক্তে **HDL** এর পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করা। ২৮% মানুষ বলেছেন, শারীরিক পরিশ্রম বাড়ালে বা নিয়মিত ব্যায়াম করলে রক্তে **HDL** বাড়ে । আবার ৩৬% মানুষ বলেছেন, খাবারের সাথে পরিমাণমতো মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণ এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট পরিহার করলে রক্তে **HDL** বাড়ে। তার মানে সব ধরণের ফ্যাটই যে খারাপ এমন নয়। যেমন - জরিপকৃত ৫০০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৩৩% মানুষ বলেছেন মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরের জন্য কম ক্ষতিকর। আবার ১৯% মানুষ বলেছেন ট্রান্স ফ্যাট শরীরের জন্য কম ক্ষতিকর, আর ২০% মানুষ বলেছেন স্যাচুরটেড ফ্যাট শরীরের জন্য কম ক্ষতিকর।

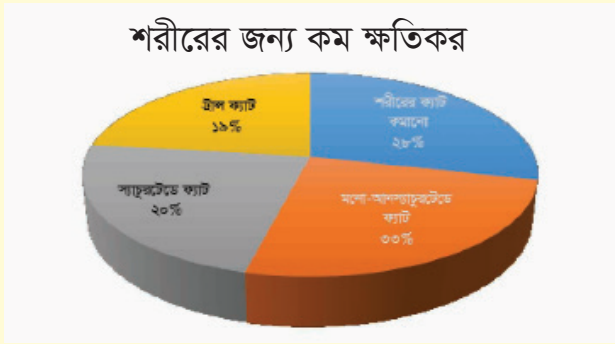

তবে এর আগে জানা দরকার কেন হৃদরোগ হয় ? এ প্রশ্নের উত্তরে ২৩% মানুষ বলেছেন উচ্চ রক্তচাপের কারণে হতে পারে, আবার ২৯% মানুষ বলেছেন রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হওয়ার কারণে হতে পারে, আর ১০% মানুষ বলেছেন স্থূলতা, কম শারীরিক পরিশ্রম কারণে, এবং ৩৮% মানুষের ধারণা ডায়াবেটিস, হৃদরোগের কারণ এবং উপরের সব কয়টি কারণেই এ রোগ হতে পারে ।

সত্যি তাই। তবে অনেক সময় কোন পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। ৩০% মানুষ বলেছেন, ডায়াবেটিস রোগীদের স্নায়ু দূর্বল হয়ে পড়ে,ব্যাথা অনুভব কমে যায় হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আবার ৩৩% মানুষ মনে করে, ব্যাথা অনুভব কমে যাওয়া হার্ট অ্যাটাক এর লক্ষণ । মূলত, আমাদের পুরো শরীরে অনবরত রক্ত সরবরাহ করে চলেছে

প্রচ্ছদ

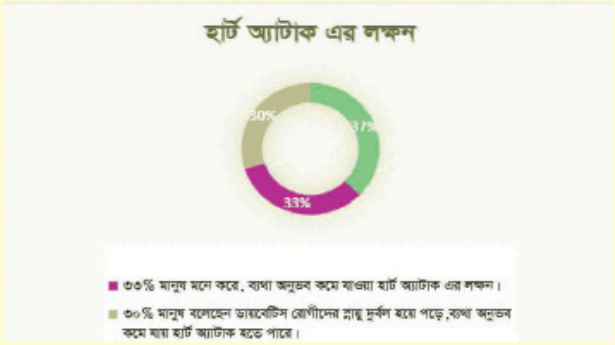

হৃৎপিন্ড। রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি পেয়ে বেঁচে থাকে আমাদের শরীরের কোষগুলো। এই হৃৎপিন্ড নিজে পুষ্টি পায় কোথা থেকে? করোনারি আর্টারি নামে হৃৎপিন্ডের গায়ে থাকে দুটি ছোট ধমনী। এরাই হৃৎপিন্ডে পুষ্টির যোগান দেয়।
কোন কারণে এই করোনারি আর্টারিতে যদি ব্লক সৃষ্টি হয় তাহলে যে এলাকা ঐ আর্টারি বা ধমনীর রক্তের পুষ্টি নিয়ে চলে সে জায়গার হৃৎপেশি কাজ করে না। তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। এর কেতাবি নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। হার্ট অ্যাটাকে বুকে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভূত হয়। এই ব্যাথা ২০-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মৃত্যুবরণ করে।

আবার যেকোন সময় ঘটতে পারে এ দূর্ঘটনা যেমন:

- বিশ্রামের সময় হতে পারে
- হঠাৎ ভারী কায়িক শ্রমের পর হতে পারে
- বাইরে ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেরুলেন, তখন হতে পারে
- ইমোশনাল স্ট্রেসের জন্য হতে পারে
- ঘুমের সময় হতে পারে

MI [হার্ট অ্যাটাক]
হার্ট অ্যাটাকের কারণ:

- এথেরোসক্লেরোসিস (Atherosclerosis) – সোজা ভাষায় করোনারি আর্টারিতে রক্তে চর্বি জমাট বেঁধে যাওয়া ও ধমনী প্রাচীর মোটা হয়ে সহজে রক্ত প্রবাহে বাধাঁ সৃষ্টি করা। একে সাধারণ ভাষায় ব্লক বলে থাকি আমরা।
- **Thrombus formation (রক্ত জমাট বেঁধে দলার মত সৃষ্টি করে)**
- **Coronary artery stenosis (রক্তনালী সরু হয়ে যায়, ফলে রক্ত প্রবাহ বিঘ্নিত হয়)**

Risk Factors:

কিছু কারণ আছে যা হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রণ যোগ্য যেমন বয়স, লিঙ্গ, বংশগত কিন্তু কিছু কারণ আছে যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য যেমন-

- ধূমপান
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাইপার লিপিডেমিয়া
- ডায়াবেটিস
- মুটিয়ে যাওয়া
- কায়িক পরিশ্রমের অভাব
- উচ্চ চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ ও আঁশ জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া
- মানসিক চাপ
- মদ্যপান
- হাইপো-ইস্ট্রোজেনিমিয়া
- জন্মনিয়ন্ত্রক পিল

সাধারণত ধূমপান এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকির পরিমাণটা বাড়ে। জরিপে ৩৭% মানুষ বলেছেন এর কারণ উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হার্টকে সারা শরীরের রক্ত সরবরাহ করতে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় ফলে একসময় হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার ২০% মানুষ বলেছেন অনেকে স্ট্রেস এ থাকলে নাকি বেশী ধূমপান করে যা হার্ট এর ক্ষতি সাধন করে, আর ১৮% মানুষ বলেছেন অতিরিক্ত কাজ করতে করতে হার্ট এর মাংস পেশি বড় হয়ে যায় ফলে ক্ষতি সাধন হয়, এবং ২৫% মানুষ বলেছে এক সময় হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যার কারণে ক্ষতি সাধন হয়।

এছাড়াও ধূমপানের মাধ্যমে হাতে বা পায়ে এক সময় পচন ধরতে পারে। ৩০% মানুষ বলেছেন ধূমপানের কারণে রক্তনালীর দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি হয় ফলে পচন ধরতে পারে এক সময় এটা তারা জানেন।

আবার ২৫% মানুষের ধারণা ধূমপানের কারণে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমে রক্তনালী প্রদাহের কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০% মানুষ বলেছেন যদি হাতে বা পায়ের রক্তনালীর এরকম সমস্যা হয় তাহলে রক্তের অভাবে হাতে বা পায়ে পচন ধরতে পারে ধূমপান সেবনের মাধ্যমে।

কিভাবে বুঝবেন হার্ট অ্যাটাক?

বুকে প্রচন্ড ব্যাথা হবে। এরকম লাগতে পারেঃ

- হঠাৎ অনুভব করবেন ভারী কিছু একটা যেন চেড়ে বসে আছে আপনার বুকের উপর
- বুকের ব্যাথা মনে হবে যেন বুক চিঁড়ে ফেলছে
- হজম হবে না, পেটের উপরের অংশে জ্বালাপোড়া করবে
- এছাড়াও ছোট ছোট ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা, ঘেমে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ঝাঁপসা দেখা, বমি, এসব হতে পারে

কি করা উচিত?

হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ধরতে পারলে রোগীকে তাৎক্ষনিক এসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাইয়ে দেওয়া ভাল। এতে রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ হবে। জিহবার নিচে
নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে দিতে হবে। রোগীকে আশ্বস্ত রাখা, দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তার নানান ধরণের চিকিৎসা দিতে পারেন। প্রয়োজন মোতাবেক ডাক্তার মেডিসিন বা সার্জারির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তা করার জন্য প্রয়োজন হবে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার। অনেক সময় হার্ট এ রিং বসাতে হয়। সাধারণত হার্টের রক্তনালীতে যদি ব্লক থাকে তাহলে রক্ত প্রবাহ বিঘ্নিত হয় বা বাকগ্রস্থ হয় ফলে হার্ট এ রিং বসাতে হয়। অন্যদিকে বাইপাস সার্জারি পরবর্তী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা আবশ্যক। জরিপে অংশগ্রহণকারী ২১% মানুষ বলেছেন বাইপাস সার্জারির পর ভারী কাজ বা অতিরিক্ত চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হয়, আর ৩৪% মানুষ বলেছেন দুশ্চিন্তা, হঠাৎ রেগে যাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত, আবার ২৯% মানুষ বলেছেন ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগ রাখা এবং পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, ঔষধ সেবন করা , পরিমাণে সঠিক খাদ্যাভ্যাস নিয়ম -তান্ত্রিক জীবনযাপন করা উচিত।

পরিমিত খাবারের সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক চাপ না নেওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণ আর ধূমপান না করায় দৈনন্দিন জীবনে এ কয়টি অভ্যাস আপনার হৃৎপিণ্ডকে রাখবে সুস্থ-সবল। দৈনন্দিন জীবনে নানা কৌশলে আপনি এসব অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন খুব সহজেই। আসুন জেনে নিই হৃৎপিণ্ড ভালো রাখার সহজ উপায়:

শারীরিক ব্যায়াম করা:

হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে সপ্তাহে ন্যূনতম পাঁচ দিন করে রোজ ৩০ মিনিট ব্যায়ামের প্রয়োজন বড়দের। কিন্তু ব্যায়ামের অভ্যাস না থাকলে হুট করে শারীরিক কসরতের মাধ্যমে ঘাম ঝরানো ভীষণ ক্লান্তিকর ব্যাপার। এ কারণে বাসায় বাচ্চাকাচ্চা থাকলে তাদের সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে ব্যায়ামের কাজটা সেরে নিতে পারেন। সেটা হতে পারে কায়িক পরিশ্রমের যেকোনো খেলা।

জেনে রাখুন

আমাদের উচিত হৃদরোগ প্রতিরোধ করা এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

- ধূমপান না করা
- মাদক থেকে দূরে থাকা
- দুশ্চিন্তা না করা
- রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ
- কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ
- চর্বি জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া
- শাকসবজি, ফল বেশি খাওয়া
- দেহের অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলা
- প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা । অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা

প্রহ্লাদ

বাচ্চাকাচ্চা না থাকলেও সমস্যা নেই। একটু হাঁটা কিংবা সাংসারিক কাজের মধ্য দিয়ে ব্যায়ামের রুটিন সেরে নিতে পারেন। প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম মানে যে টানা আধাঘণ্টা ব্যায়াম করতে হবে, সেটা কিন্তু নয়। এ সময়টাকে ভেঙে নিতে পারেন। সকালে ১০ মিনিট ঘাম ঝরালেন, দুপুরে অফিসে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় ১০ মিনিট হেঁটে খেতে গেলেন, অফিস থেকে ফেরার পর বিকেলে কিংবা রাতে এ রকম আরও কিছু কাজ দিয়ে ব্যায়াম সেরে নিতে পারেন।

খাদ্যাভ্যাস:

আপনি প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত 'স্যাচুরেটেড ফ্যাট' (ক্ষতিকর স্নেহ পদার্থ) খেতে ভালোবাসেন। যেমন ধরুন, 'রেড মিট' কিংবা পূর্ণমাত্রায় ফ্যাটযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি। হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে এসব খাবার ছাড়তে হবে। কিন্তু ছাড়বেন কীভাবে? আপনি তো বদভ্যাসের দাস! ভাববেন না, উপায় আছে। অভ্যাসটা ধীরে ধীরে পাল্টান। 'রেড মিট'-এর মেন্যুতে ধীরে ধীরে 'লো-ফ্যাট মিট' যোগ করুন।
দুগ্ধজাত খাবারের পরিবর্তে জলপাই কিংবা 'ক্যানোলা অয়েল' খেতে পারেন। খাবারে লবণের পরিমাণ কমান। প্রক্রিয়াজাত কিংবা প্যাকেটজাত খাবার কম খান। প্রতিদিনের খাবারে ১ হাজার ৫০০ মিলিগ্রামের বেশি লবণ খাবেন না। ভালো করে রান্না করলে শাকসবজি খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। শাকসবজি খান প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই কাপ, সঙ্গে থাকুক ফলমুল। শস্যদানা বা 'গ্রেইন'যুক্ত খাবার খেতে পারেন, যেমন বাদামি চাল, বার্লি, পপকর্ন, ওটমিল, গমের রুটি, গমের প্যানকেক ইত্যাদি।

বিশ্রাম:

দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে পরিমিত বিশ্রাম নিন। মানে, স্রেফ কিছুই করবেন না, কোনো চাপ নেওয়ার দরকার নেই। পূর্ণমাত্রায় বিশ্রাম হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী। যুক্তরাষ্ট্রের 'একাডেমি অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়াবেটিস'-এর চিকিৎসক সুসান মুরের ভাষ্য, হৃৎপিণ্ডের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় মানসিক চাপ 'খলনায়ক'-এর ভূমিকা পালন করে। গোটা স্বাস্থ্যের ওপরই এটা মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আর তাই মাঝেমধ্যে কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ান। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ করুন। সাংসারিক কিংবা অফিসের কাজ ভুলে যান। স্রেফ নিজের জন্য বিশ্রাম নিন। সেটা শুয়ে-বসে যেকোনোভাবে। বিশ্রাম নেওয়ার পর দেখবেন ভীষণ ফুরফুরে লাগছে। মানে, ওই বিশ্রামের সময়টুকু আপনাকে কাজের জন্য উজ্জীবিত করে তুলবে।

স্থূলকায় মানুষের ওজন নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই। ওজন কমাতে ক্যালরির হিসাব করছেন, ব্যায়াম করছেন কিন্তু তারপরও কমছে না কিছুতেই। একটু মাথা খাটান। আপনি কি স্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছেন? স্বাস্থ্যকর খাবার আর ক্যালরিযুক্ত খাবার কিন্তু এক নয়। পুষ্টিকর খাবার খান এবং ক্যালরি খরচ ও গ্রহণে ভারসাম্য আনুন। তরল খাবার খেতে পারেন। শাকসবজি থাকুক প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায়। এ ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম করুন। প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা বাধ্যতামূলক করুন। লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। বাসা থেকে বের হয়েই রিকশা না নিয়ে হেঁটে কিছুটা পথ এগোন। বাসায় ফেরার পথেও একই কৌশল অনুসরণ করুন।

ধূমপান:

ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি। এ বদভ্যাসটি ছাড়ার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। যে যার মতো করে চেষ্টা করে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ, পরিবারের সাহায্য কিংবা এ দুটি ব্যাপার মিলিয়ে চেষ্টা করলে সুফল পেতে পারেন। ধূমপানের অপকারী দিকগুলো নিয়ে ভাবুন। এটা ছাড়ার উপকারী দিকগুলোতে মনোযোগী হতে পারেন। ধূমপায়ী বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়। মদ্যপান এড়িয়ে

চলুন, এটা ধূমপানে আপনাকে আরও আকৃষ্ট করবে। শরীরচর্চার মধ্যে থাকলে ধূমপানের ইচ্ছা কমে যেতে পারে। কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে থাকলেও সুফল পেতে পারেন।

ইতিবাচক মনোভাব ও চাপ কমান:

হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে মানসিক প্রশান্তির বিকল্প নেই। কিন্তু কর্মক্ষেত্র, সমাজ কিংবা পরিবার থেকে মানুষ নানাভাবে চাপে থাকে। এসব চাপ যেমন মোকাবিলা করতে হবে, তেমনি বুদ্ধি করে কমাতেও হবে। প্রতিদিনের কাজের চাপ শেষে নিজের জন্য আলাদা করে একটু সময় বের করুন। পছন্দের গান শুনতে পারেন কিংবা বই পড়তে পারেন। কোনো কারণে মনে কষ্ট পেলে তা বন্ধু কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিন। মনে কষ্ট পুষে রাখবেন না। এ ধরণের অভ্যাস হৃদ্‌রোগ ডেকে আনে। সবচেয়ে ভালো হয় পরিবার

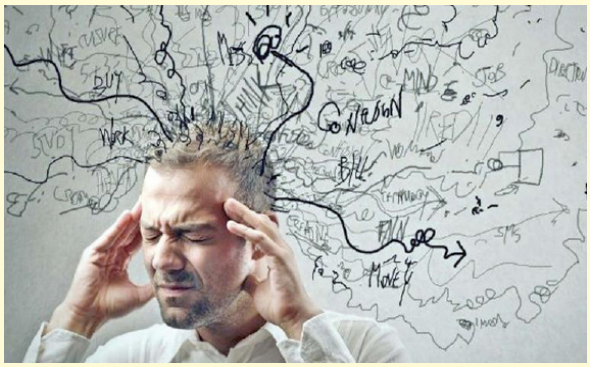

কিংবা কর্মক্ষেত্রে চমৎকার সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলা। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৮০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ একাকিত্ব বোধ করেন এখনকার মানুষ।
অর্থাৎ ১৯৮০ সালে এ হার ছিল ২০ শতাংশ, এখন ৪০ শতাংশ। একাকিত্ব শুধু মানসিক ক্ষতি করে না, শারীরিক ক্ষতিও করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, কেউ যখন কারও সঙ্গে কথা বলে, তখন হরমোন নিঃসরণের মাধ্যমে মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এতে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম দারুণ সচল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে মানসিক চাপ কমানো এবং চারপাশের মানুষের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলাও জরুরি।

দূষিত বায়ু এড়িয়ে চলুন:

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে দূষিত বায়ুর পরিমাণ বেড়েছে। আবহাওয়াবিদদের ভাষ্য মতে, শীতকালে সকালের দিকে বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। সাধারণত বাতাসে থাকা অতিরিক্ত ধাতব পদার্থ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ধমনিরপ্রাচীরকে আরো পুরু করে তোলে, যে কারণে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয়।

ডিম খান:

যারা বলছেন, বেশি বেশি ডিম খেলে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ। কেননা ব্রাজিলীয় গবেষকরা জানিয়েছেন, ডিমের কুসুমে থাকা ভিটামিন ই, বি-১২ এবং ফলেট করোনারি আর্টারিকে পরিষ্কার রাখে। তবে কেউ যদি দিনে চারটি করে ডিম খেতে থাকেন, তবে তাঁকে এসব গবেষণার কথা ভুলে যেতে হবে।

শ্বাসের ব্যায়াম করুন:

না, নিজের ইচ্ছামতো গতিতে শ্বাস নিতে কিংবা ছাড়তে বলা হচ্ছে না। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন শ্বাসের ব্যায়াম করুন। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে ৩০ সেকেন্ডে ছয়টি পূর্ণাঙ্গ শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পন্ন করুন। এরপর সময়ের পরিমাণ কমাতে থাকুন। এ ব্যায়াম আপনার হৃদ সংকোচন সংক্রান্ত চাপ কমাতে ভূমিকা রাখবে।

সময়মত ঘুমান:

যাদের অনিদ্রা নামক রাজরোগ আছে, তারা অন্যদের চেয়ে ৪৫ শতাংশ বেশি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুমের জন্য প্রতিদিন বেশি বেশি শারীরিক পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

কম চর্বিযুক্ত খাবার খান:

খাবারে থাকা চর্বি হৃৎপিণ্ডকে অকার্যকর করে তুলতে ভূমিকা রাখে। সুতরাং খাদ্য তালিকা থেকে নিয়মিতভাবে চর্বির পরিমাণ কমাতে থাকুন, তবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পুষ্টি যাতে প্রতিদিন খাদ্যে বরাদ্দ থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রচ্ছদ

এনার্জি ড্রিংক্স থেকে বিরত থাকুন:

শক্তিবর্ধক এসব পানীয়কে 'শত্রু' হিসেবে গণ্য করুন। কেননা এসব পানীয় কোনোভাবেই আপনার কোনো ধরণের উপকারে আসবে না, উল্টো রক্তচাপ বাড়িয়ে মুহূর্তেই আপনাকে ধসিয়ে দেবে।

গান গান:

হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে গলা ছেড়ে গান গাইতেও উৎসাহিত করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, দলবদ্ধ সংগীত কিংবা কারাওকে হাসিখুশি রাখে হৃদযন্ত্রকেও।

সামাজিক যোগাযোগ বাড়ান:

একা বাস করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা অন্যদের তুলনায় বেশি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে থাকে। তাই অন্যদের সঙ্গে কথা বলুন, হাত মেলান, জড়িয়ে ধরুন এবং আরো বেশি সামাজিক হতে চেষ্টা করুন; নিজের স্বার্থেই।

যেসব খাবার হার্টের জন্য ভালো:

ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাবেন। এ ধরণের খাবারে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা হার্ট ভালো রাখার জন্য অন্যতম একটি উপাদান। হলুদ, সবুজ, কমলা, লাল রঙের সবজি ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ। ফলের মধ্যে অ্যাভোকাডো হার্টের জন্য সব থেকে উপকারী। অ্যাভোকাডোতে সব ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। বিশেষ করে অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই আছে। হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ভিটামিন-ই খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া কমলা, আপেল, কলা, স্ট্রবেরি, আঙুর, লেবু ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন-সি রয়েছে, যা হার্টের পক্ষে খুব উপকারী।

কী ধরণের খাবার খাবেন:

সবুজ শাকসবজির মধ্যে পালংশাক, ধনিয়াপাতা, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, কুমড়া, লাউ, ব্রকোলি, গাজর, ভুট্টা, বিট, পেঁয়াজ, মিষ্টিআলু হার্টের জন্য ভালো। প্রোটিন জাতীয় খাবারের মধ্যে সয়াবিন, বাদাম, সূর্যমুখী বা তিলের বীজ, রাজমা, ডাবলি বুট, তৈলাক্ত মাছ খেতে পারেন।
বার্লি, জোয়ার, বাজরা, আটার রুটি, ওটস, ব্রাউন রাইস হার্টের জন্য উপকারী। মশলার ভেতর আদা এবং রসুন রান্নায় ব্যবহার করুন। এসব মশলা খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ ব্যালান্স করে, কোলেস্টেরল কম রাখতে সাহায্য করে।

কী ধরণের খাবার খাবেন না:

ময়দা, চিনি, প্রসেস্ড ফুড, ডিমের কুসুম, লাল মাংস না খেলেই বেশি ভালো। খেলেও পরিমাণে খুবই কম খাবেন। দুগ্ধজাতীয় খাবার কম খাবেন। অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন। সিগারেট খাবেন না।

রান্নায় কী ধরণের তেল ব্যবহার করবেন:

মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। বাদাম তেল, অলিভ অয়েল, তিলের তেলে রয়েছে মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। রান্নায় এই ধরণের তেল ব্যবহার করুন। ভেজিটেবল অয়েল দিয়েও রান্না করতে পারেন। এতে আছে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যা হার্টের জন্য ভালো। নারিকেল তেল বা পাম অয়েল রান্নায় ব্যবহার করবেন না।

পরিশেষে

হৃদয়ের খবর রাখা জরুরী সেইসাথে প্রয়োজন যথাযথ যত্নআত্তি। সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই। তাই দেরী না করে জেনে নিন আপনার হৃদয় ভালো আছে কিনা। দেশে যেকোন হাসপাতালেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সহজেই জেনে নিতে পারেন আপনার হৃদয়ের খবর এবং সে অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করে সুস্থ থাকুন।

নাজনীন নাহার
লেখক ও সাংবাদিক

চিনি খেলে ডায়াবেটিস হয়?

বর্তমান বিশ্বে অসংক্রামক ব্যাধিগুলোর মধ্যে ডায়াবেটিস অন্যতম; চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় "ডায়াবেটিস মেলাইটাস"। একদিকে যেমন এ রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে রোগটি নিয়ে নানা কুসংস্কার। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৯ লাখ যা মোট জনসংখ্যার ৮.৫% ।আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেটের যুগে ওয়েবসাইটে সার্চ দিলেই বের হয়ে আসে নানা তথ্য। তারপরও ডায়াবেটিস নিয়ে কিছু সাধারণ বিশ্বাস মানুষের মনে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ডায়াবেটিসের পরিধি এতোটাই বিস্তৃত যে এটা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করা যাবে। আজকের লেখা ডায়াবেটিসের কারণ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে। প্রথমেই জেনে নেয়া যাক কিছু প্রাথমিক বিষয়।

ডায়াবেটিস কি?

ডায়াবেটিস মূলত একটি হরমোনজনিত রোগ যা অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত ইনসুলিনজনিত কারণে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই রোগে ইনসুলিন স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা একেবারে অনুপস্থিতও থাকতে পারে। আবার অনেক সময় ইনসুলিন স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলেও কম সংবেদনশীলতা বা ইনসুলিন প্রতিরোধধর্মীতার কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে।

ডায়াবেটিস কয় প্রকার?

প্রাথমিকভাবে ডায়াবেটিসকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা-

ক) টাইপ-১ ডায়াবেটিস মেলাইটাসঃ
এ ধরণের ডায়াবেটিসে ইনসুলিন কম থাকে বা অনুপস্থিতও থাকতে পারে। সাধারণত কম বয়সে এ ডায়াবেটিস বেশি দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে মাত্র ১১ লাখ মানুষ এ ধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ ধরণের ডায়াবেটিসে রোগীর ওজন স্বাভাবিক থাকে বা স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয়।

খ) টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলাইটাসঃ
এ ধরণের ডায়াবেটিসে ইনসুলিনের মাত্রা স্বাভাবিকই থাকে কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারে না। এই প্রকার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর ওজন বেশি হয়। সাধারণত, ৪০ বছরের পর টাইপ-২ ডায়াবেটিস বেশি হয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ৯০% ই টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন।

গ) গর্ভজনিত ডায়াবেটিস মেলাইটাসঃ
গর্ভাবস্থায় এ ধরণের ডায়াবেটিস হয়। এ ক্ষেত্রে রোগীর নিজের বা পরিবারের কারো ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা গর্ভাবস্থার একটি জটিলতা। গর্ভপাতের পর এই ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায়। তবে রোগীর পরবর্তী জীবনে বা পরের বার গর্ভধারণের সময় টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ঘ) অন্যান্য প্রকার ডায়াবেটিসঃ
উপরের তিনটি প্রকরণ ছাড়াও অন্যান্য রোগের কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে। কিছু হরমোনজনিত রোগ, ঔষধ, বংশগত রোগের কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে।

ডায়াবেটিস কেন হয়?

সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা হল, মিষ্টি বেশি খেলেই ডায়াবেটিস হয়। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মূল বিষয়টি হচ্ছে, শুধু ডায়াবেটিস রোগী নয়, এমনকি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিরও শুধু মিষ্টি নয়, বরং খাদ্যের অন্য সব উপাদানও পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। জেনে নেয়া যাক ডায়াবেটিস রোগের কারণ কি।

Immune mediated ডায়াবেটিসঃ

৫-১০% টাইপ-১ ডায়াবেটিসে অটোইমিউন মেকানিজমে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন নিঃসারক বিটা কোষ ধ্বংস হয়ে যায়। সাধারণত জীনগত ত্রুটির কারণে এরকম হয়ে থাকে।

বংশগত:

পরিবারে কারো ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। এমনকি কিছু কিছু জেনেটিক রোগও ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে। যেমন-ডাউন'স সিনড্রোম।

ওজন:

আমাদের সবার শরীরেই ডায়াবেটিসবাহী জীন থাকে। পরিবেশগত উপাদানগুলো দ্বারা প্রভাবিত হলে জীনগুলো কার্যক্ষম হয়ে যায়। ওজন বৃদ্ধি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীরের অতিরিক্ত ওজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কাজেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সুষম খাদ্য ও নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত।

বয়স:

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষত বয়স্কদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হয়। এ কারণে বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

জীবন ধারণ পদ্ধতি:

আজকের পৃথিবীতে সবাই এন্ড্রয়েড ফোন, ইন্টারনেট, টিভি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এখন আর কেউ বাহিরে খেলাধুলা করে না কেননা ফোনেই আছে হরেক রকম গেমস। আবার বাইরে হেঁটে আসার অভ্যাসটাও বিলুপ্ত প্রায়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই আলসেমিই ডায়াবেটিসের অন্যতম সহায়ক। অলস ব্যক্তিদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। আবার বহুমুখী জীবনে কাজের চাপসহ থাকে নানা দুশ্চিন্তা। এ ধরণের স্ট্রেস শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসিডিটিসহ অন্যান্য ছোটোখাটো শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি তা ডায়াবেটিসেরও নিয়ামক। কাজেই দুশ্চিন্তা কমাতে হবে। প্রতি ৩০ মিনিট পর পর বসা বা শোয়া থেকে উঠে ৫ মিনিট হেঁটে আসতে হবে বা স্ট্রেচিং করতে হবে।

অপুষ্টি:

বাচ্চা পেটে থাকার সময় মা ঠিকমত পুষ্টিকর খাবার না খেলে বা অল্প বয়সে সঠিক পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হলে পরবর্তীতে বাচ্চার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। পুষ্টির অভাবে অগ্ন্যাশয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ফলে পরবর্তীতে স্বাভাবিক মাত্রায় ইনসুলিন নিঃসরণ করতে পারে না। অতএব গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাভাবিক পুষ্টি নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।

ধূমপান:

বলা হয়, ধূমপানে বিষপান। শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যা ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ধূমপান ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। নিজ প্রয়োজনেই ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

খাদ্য:

কিছু কিছু খাদ্য ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে গরুর দুধ, কফি, পোড়ানো এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস, গমজাতীয় খাদ্য, সয়াবীন ইত্যাদি। এসব খাবার পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে যেন তা শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়।

ভাইরাস:

এমনকি কিছু ভাইরাসও ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে। তবে সাধারণত যেসব বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় না তাদের ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অতএব বাচ্চা জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ নিশ্চিত করতে হবে।

ইডিওপ্যাথিক ডায়াবেটিস মেলাইটাস:

অনেক সময় অজ্ঞাত কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে যাকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক ডায়াবেটিস মেলাইটাস।

উপসংহার:

ডায়াবেটিস নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে প্রধান ৩ টি নিয়ামক- সুষম খাদ্য, পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাভাবিক পদ্ধতির জীবন ধারন। শুধু ডায়াবেটিস হলেই সচেতন না হয়ে বরং হওয়ার আগে সচেতন হলে এ রোগ নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, Prevention is better than cure.

আপনার গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার বাতি/এসি/ কিংবা ফ্যান প্রয়োজন ছাড়া চালিয়ে রাখবেন না।

আপনার গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার অতিরিক্ত বাতি কিংবা ফ্যান চালিয়ে রাখবেন না। যদি দু'একটা বাতি নিভিয়ে রাখলেও আপনার কাজের অসুবিধে না হয়, তবে একটা কিংবা দু'টো বাতি নিভিয়ে রাখুন। আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন একটি বাতি, এসি কিংবা ফ্যানে যতটুকু বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, এক্ষেত্রে হাজার, লক্ষ গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার প্রয়োজন ছাড়া কিংবা অতিরিক্ত বাতি/এসি কিংবা ফ্যান চালিয়ে না রাখলে লক্ষ লক্ষ ওয়াট সাশ্রয় হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করবে, অপর দিকে এই সাশ্রয়ী অর্থ দেশের উন্নয়নে এক বিশাল অবদান রাখবে।

সৌজন্যে –
হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী

ভ্যাক্সিন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ভ্যাক্সিন কি?

ভ্যাক্সিন হল কৃত্রিম উপায়ে তৈরীকৃত ওষুধ যা মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে যাকে 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি (acquired immunity)' বলে। ভ্যাক্সিনে যে উপাদান থাকে তা আক্রমণকারী জীবাণুর সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি তৈরী করা হয় জীবাণুর মৃত অংশ (killed forms of microbe) এবং জীবাণুর বিষ (toxin) থেকে। ভ্যাক্সিনের যে উপাদানটি শরীরে প্রবেশ করানো হয় তা কোন জীবাণু পরবর্তীতে শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের 'ইমিউন সিস্টেম' বা রোগ প্রতিরোধ কারী ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে এবং ঐ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন রকম রিঅ্যাকশন শুরু করে।

ভ্যাক্সিন দুই ভাবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যায়ঃ প্রতিষেধক হিসেবে (যেমনঃ কোন জীবাণুর আক্রমণ থেকে ভবিষ্যতে শরীরকে রক্ষা করা) ও ঔষধ (যেমনঃ ক্যান্সার চিকিৎসার ঔষধ) হিসেবে।

ভ্যাক্সিন প্রদান করাকেই 'ভ্যাক্সিনেশন' বলে। বিভিন্ন রকম সংক্রামক ব্যাধি রোধে এখন পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন-ই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা; এই ভ্যাক্সিনেশনের ফলেই আজ পৃথিবী থেকে 'স্মল পক্স (smallpox)' দূরীভূত হয়েছে, polio, measles, tetanus এর মত রোগের বিস্তার রোধ সম্ভব হয়েছে। ভ্যাক্সিনেশনের কার্যকারিতা নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে; যেমন, ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) ভ্যাক্সিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের বিরুদ্ধে HPV vaccine, চিকেন পক্স (chicken pox) ভ্যাক্সিন। The World Health Organization (WHO) এর রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ২৫ প্রকার প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক ব্যাধি এর বিরুদ্ধে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভ্যাক্সিন রয়েছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহঃ

'জাতীয় টিকা দান কর্মসূচী' এর অধীনে যে সকল টিকা প্রদান করা হয় তা সবই নিরাপদ ও কার্যকর। তবে বাস্তবতা হলো, কোন টিকা বা ভ্যাক্সিন-ই 'সম্পূর্ণ' ঝুঁকিমুক্ত নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে টিকা দানের পর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়াসমূহ বিভিন্ন রকম হতে পারে। এগুলো উপলব্ধি করার জন্য এই প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে হবেঃ

- কী কারণে প্রতিক্রিয়াটি হলো?
- এটি কি টিকা থেকে হলো, নাকি টিকা দানের প্রক্রিয়া থেকে? নাকি এটির টিকা দানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই?
- প্রতিক্রিয়া কি অল্প (minor) না বেশি (severe)?

'টিকা দানের পর বিরূপ প্রতিক্রিয়া' বা 'Adverse event following immunization (AEFI)' হলো টিকা দানের পর একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা যার সাথে টিকা প্রদানের কোন কার্যকর সম্পর্ক নেই।

'টিকা দানের পর বিরূপ প্রতিক্রিয়া' বা AEFI কে ৫ টি গ্রুপে ভাগ করা হয়ঃ

ভ্যাক্সিনের উপাদানের জন্য সৃষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যেমনঃ ডিটিপি ভ্যাক্সিন প্রদানের পর যদি হাত-পা অসম্ভব ফুলে যায়

ভ্যাক্সিনের গুণগত মানে ঘাটতি থাকলে যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। যেমনঃ পোলিও ভ্যাক্সিনের উপাদান পোলিও ভাইরাস কে যদি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম বা মেরে না ফেলা হয় তাহলে পোলিও ভ্যাক্সিনের জন্য প্যারালাইটিক পোলিও হতে পারে।

সঠিক উপায়ে ভ্যাক্সিন প্রদান না করা হলে যে প্রতিক্রিয়া হয়। যেমনঃ ভুল ভ্যাক্সিন প্রদান, একই ভায়াল দিয়ে আরেকজনকে ভ্যাক্সিন প্রদানের ফলে ইনফেকশন হলে।

টিকা বা ইঞ্জেকশনের ভয়ে সৃষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। যেমনঃ ভয়ে কেউ সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

সমকালীন বা সমসাময়িক সমস্যা। যেমনঃ ভ্যাক্সিন প্রদানের পর কারো শরীরে জ্বর আসলো, কিন্তু তা আসলে তার শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু যা আগেই তাকে আক্রান্ত করেছিল, সেটি দ্বারা সৃষ্ট।

টিকা দানের পর মারাত্মক প্রতিক্রিয়াসমূহ দেখা দিতে পারে। প্রতিক্রিয়াগুলোকে 'মারাত্মক' বলা যাবে নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রসমূহে, যেমনঃ

- মৃত্যু হলে
- জীবন নাশের ঝুঁকি থাকলে
- হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হলে
- স্থায়ীভাবে শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিলে
- জন্মগত ত্রুটি বা রোগ হলে।

- মৃত্যু হলে, হাসপাতালে ভর্তি হলে, শারীরিক অক্ষমতা বা এমন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যা স্বাস্থ্য কর্মী বা সাধারন জনগণ ধারনা করছেন ভ্যাক্সিনেশনের জন্য হয়েছে
- অয়ানাফাইল্যাক্সিস বা জীবন নাশক অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন
- টক্সিক শক সিনড্রোম
- এনকেফালোপ্যাথি
- সেপসিস
- ভ্যাক্সিনের গুণগত মান নিয়ে সন্দিহান হলে
- প্যারালাইসিস

যে সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রতিবেদন পেশ করার প্রয়োজন নেই

গৌণ বা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াসমূহ	চিকিৎসা	কখন প্রতিবেদন পেশ করতে হবে
ব্যথা, ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া	• ঠান্ডা সেঁক নেয়া • প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে	অ্যাবসেস বা পুঁজ হলে
জ্বর > ৩৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস	• বেশী করে পানি পান • গা মুছিয়ে দেয়া বা টেপিড স্পঞ্জিং • প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে	অন্যান্য লক্ষণ থাকলে যেমন বমি, পেটে ব্যথা, শারীরিক অবস্থা বেশী খারাপ বা মারাত্মক হলে।
খিটখিটে ভাব, শরীর ম্যাজম্যাজ করা ইত্যাদি	• পানি বা স্যালাইন • প্যারাসিটামল সেবন	মারাত্মক বা অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে

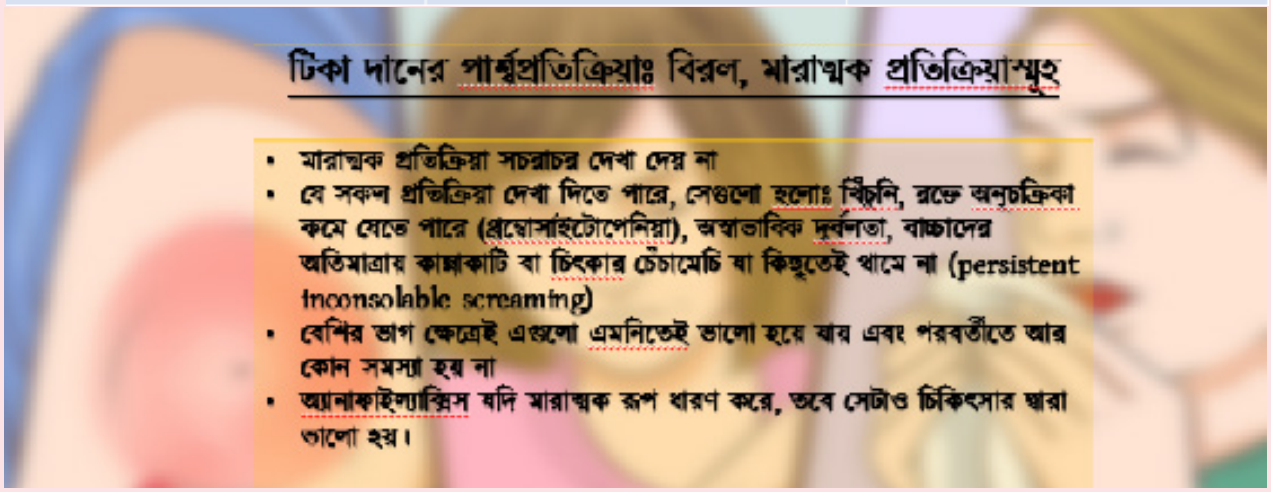

যে সকল বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন পেশ করা জরুরীঃ

- মরণাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি, বিকলাঙ্গতা)
- নতুন ভ্যাক্সিন প্রদানের পর থেকে কোন সন্দেহজনক সমস্যা দেখা দিলে
- টিকা দান কর্মসূচির ভুলের কারণে সৃষ্ট সমস্যা
- টিকা দানের ৩০ দিন পর কোন অস্বাভাবিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে
- টিকা প্রদানের স্থানে ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া, ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা যদি ৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয় অথবা ফুলে যাওয়ার স্থান যদি নিকটবর্তী অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট কে আক্রান্ত করে।

লক্ষণীয় বিষয়সমুহঃ

- কোন ভ্যাক্সিন-ই “perfect” না যা যে কোন ধরণের রোগ থেকে রক্ষা করবে এবং সবার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।
- অনেক কার্যকর ভ্যাক্সিন (যেমন- সুরক্ষিত ইমিউনিটি বা ‘protective immunity’ দানকারী ভ্যাক্সিন) কিছু অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
- বেশির ভাগ প্রতিক্রিয়াসমূহ যা মনে করা হয় টিকা প্রদানের

সাথে জড়িত, সেগুলোর সাথে আসলে টিকা বা ভ্যাক্সিনের কোন সম্পর্কই নেই। অধিকাংশই হয় সমকালীন সমস্যার জন্য উদ্ভূত অথবা মানব ত্রুটির জন্য সৃষ্ট।

- কার কি সমস্যা হবে তা টিকা দেয়ার আগে থেকে সবার ক্ষেত্রে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্র সমূহে টিকা প্রদানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে যেগুলো মেনে চললে এই ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ডা: গুলশান আখতার
এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
ডিপার্টমেন্ট অব পেডিয়াট্রিকস
গ্রিন লাইফ মেডিক্যাল কলেজ

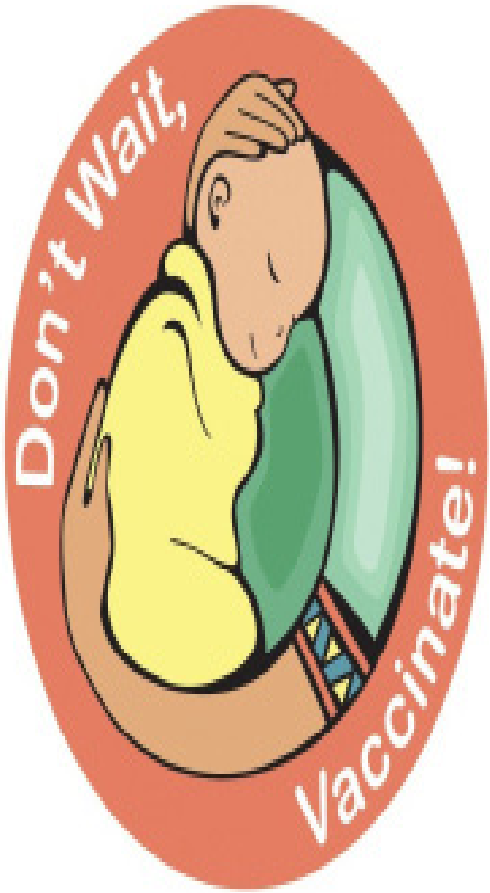

জন্মগত হৃদরোগ (congenital heart diseases)

জন্মের সময়ই অনেক শিশু হৃদপিন্ডের সমস্যা নিয়ে জন্মায়। বিশ্বে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ন্যূনতম ৮ জন জন্মগত হৃদরোগ নিয়মে জন্মায়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রকাশিত তথ্য মতে, বিশ্বে হৃদরোগ নিয়ে জন্মানো শিশুর শতকরা ৬ ভাগ বাংলাদেশে হয়। শিশুরা জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে জন্মালে কিছু লক্ষণের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। এ ধরণের রোগ হলে শিশু জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যায় ভোগে এবং কেউ কেউ খাবার সময় বা কান্না করলে নীল/কালচে-নীল হয়ে যায়। আবার অনেক সময় জন্মগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পায় না, কিন্তু পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে লক্ষণসমূহ দেখা দেয়। এই সকল ত্রুটিসমূহ চিকিৎসকগণ সাধারণত শারীরিক পরীক্ষা এবং ইকোকার্ডিওগ্রাম(echocardiogram) এর মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। কয়েকটি সচরাচর জন্মগত হৃদরোগ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভি.এস.ডি.)/ Ventricular septal defect (V.S.D):

জন্মগত হৃদরোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ৩৬ ভাগ এই সমস্যায় আক্রান্ত। হার্ট এর নীচের অংশের দুটি প্রকোষ্ঠ, বাম ও ডান ভেন্ট্রিকল (left and right ventricles)-কে পৃথককারী পর্দার মধ্যে এক বা একাধিক ফুটো থাকার নামই ভি,এস,ডি। ডান ভেন্ট্রিকলে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ দূষিত রক্ত এবং বাম ভেন্ট্রিকলে থাকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকলে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায়,

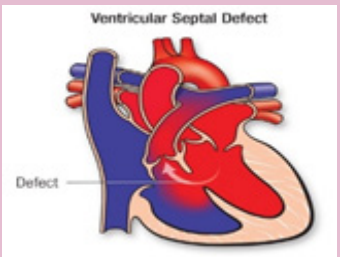

যা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরণের ভিএসডি আছে, খুব জটিল প্রকৃতির না হলে বা ডিফেক্ট খুব ছোট হলে এটা ২ বছরের মধ্যে নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তবে ছিদ্রের আকার বড় হলে বাচ্চার হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ , শ্বাস কষ্ট, বুকের অস্বাভাবিক ওঠা নামা, বয়স অনুপাতে ওজন না বাড়া, বার বার কাশি বা সর্দি লাগা, অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা, গায়ের রং পরিবর্তন হয়ে নীল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগটি অনেক সময় পরিণত বয়সে এসে ধরা পড়ে।

ইকোকার্ডিওগ্রাম(echocardiogram) পরীক্ষার মাধ্যমে ভিএসডি নির্ণয় করা যায়। কার্ডিয়াক ক্যাথেরাইজেশনের মাধ্যমে বড় কোন কাটা-ছেড়া ছাড়াই এ রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব, তবে অনেক ক্ষেত্রে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করতে হয়।

এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এ,এস,ডি)/Atrial Septal defect (ASD) :

সাধারণত গর্ভাবস্থায় বাচ্চার হৃৎপিন্ডের উপরের প্রকোষ্ঠদ্বয় যাদেরকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম, এদের মাঝে যে পর্দা থাকে তাতে একটি ছোট ছিদ্র থাকে রক্ত সংবহনের সুবিধার জন্য। জন্মের পর পরই এই ছিদ্র আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। যদি জন্মের পর তা বন্ধ না হয় তাহলে তাকে এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট বলে। এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট মোট জন্মগত হৃদরোগের শত-করা ৪ ভাগের অধিক। এ রোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ,এস,ডি ছোট হলে ২-৫ বছরের মধ্যে নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ফুটো বেশি বড় হয় বা সাথে আরো কিছু গঠনগত সমস্যা থাকে (যেমন, ওভাররাইডিং অফ সুপেরিওর ভ্যানাক্যাভা, রাইট পালমোনারি ভেনাস ড্রেইনেজ অ্যানোমালি) তাহলে শিশু জন্মের কিছুদিন পর থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় ভুগে এবং শিশুর বৃদ্ধিও নিয়মিত হয় না।

বড় এ,এস,ডি হলে অথবা নিজে নিজে বন্ধ না হলে শিশুর শরীরে অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত অনাকাঙ্খিত ভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায়, যা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। অপারেশনের দ্বারা অথবা ক্যাথেটার ডিভাইস দ্বারা ফুটো বন্ধ (closure) করা যায়। অনেক সময় পরিণত বয়স বা বার্ধক্যে এসে এই রোগটি ধরা পড়ছে। ইকোকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষা দ্বারা এ,এস,ডি নির্ণয় করা যায়।

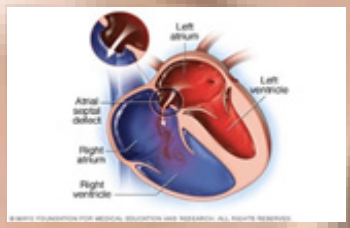

এট্রিও- ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (এভিএসডি)/ Atrio-ventricularseptaldefect (AVSD):

এই সমস্যাটি একটু জটিল প্রকৃতির। ডাউন সিনড্রোমের (Down Syndrome) রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি প্রায় দেখা যায়। এখানে হৃৎপিন্ডের উপরের ও নিচের দুই প্রকোষ্ঠগুলোর মাঝখানের পর্দায় ছিদ্র থাকে এবং রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী ভালভগুলো সঠিকভাবে কাজ করে না। এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট হলে হৃৎপিন্ড অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফুসফুসে বেশি বেশি রক্ত পাঠায়, ফলশ্রুতিতে হৃৎপিন্ড আকারে বড় হয়ে যায় এবং ফুসফুসে রক্তচাপ বেশ বেড়ে যায়। জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়। এই রোগের লক্ষণসমূহ অনেকটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টের মতই, তবে মারাত্মক ক্ষেত্রে শরীরে পানি জমা, অতিরিক্ত ঘামা, শরীরে পানি জমে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পাওয়া, গায়ের রং নীল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

টফ বা টেট্রালজি অফ ফেলট/ Tetralogy of Fallot (TOF):

এ সমস্যাটি ৪ টি ভিন্ন ভিন্ন রোগের সমষ্টিগত ফলাফল। রোগ চারটি হলো বড় আকারের ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট,পালমোনারি স্টেনোসিস, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি (হৃৎপিন্ডের ডান ভেন্ট্রিকলের মাংস বৃদ্ধি এবং মহাধমনীর অবস্থানগত অসামঞ্জস্যতা (overriding of aorta)। সাধারণভাবে অ্যাওর্টা বাম ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত

থেকে সারা শরীরের অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। ট্রেট্রালজি অফ ফেলটের ক্ষেত্রে অ্যাওর্টা (aorta) দুই ভেন্ট্রিকলের মাঝে ও ভি.এস.ডি.-এর ওপরে অবস্থান করে। প্রতি ২,০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন এই রোগ নিয়ে জন্ম লাভ করে। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো শিশুর পুরো শরীর নীল বর্ণ হয়ে যায়। বাকি লক্ষণসমূহ ভি.এস.ডি.-এর অনুরূপ। রক্ত সংমিশ্রন

রোধ করতে "Blalock–Taussig shunt" অপারেশনের মাধ্যমে প্রাথমিব

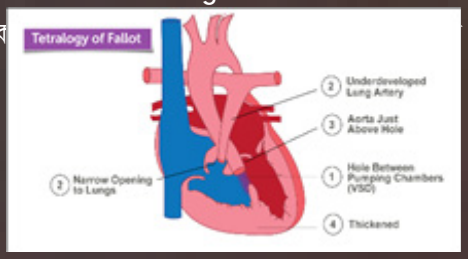

আরো অনেক জটিল অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়া রয়েছে।

ইকোকার্ডিওগ্রাম করে এই রোগ নির্ণয় করা যায়, তবে কার্ডিয়াক ক্যাথেটার করাও বেশ জরুরী। অপারেশনই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অপারেশন না করালে অধিকাংশ শিশু শৈশবেই জীবন হারাতে পারে।

প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস (পিডিএ) / Patent ductus arteriosus (P.D.A.):

ফুসফুসের ধমনীর (পালমোনারী আর্টারী) সাথে মহাধমনীর (অ্যাওরটা) অস্বাভাবিক সংযোগই পিডিএ। সাধারণত পরিণত হবার আগেই যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের এ সমস্যা বেশী হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করেই রোগ নির্ণয় করতে পারেন। ইকোকার্ডিওগ্রাম দ্বারা এই রোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। এটির আকার ছোট হলে ক্যাথেটার ডিভাইস ক্লোজার এবং বড় হলে সার্জারি করা লাগে।

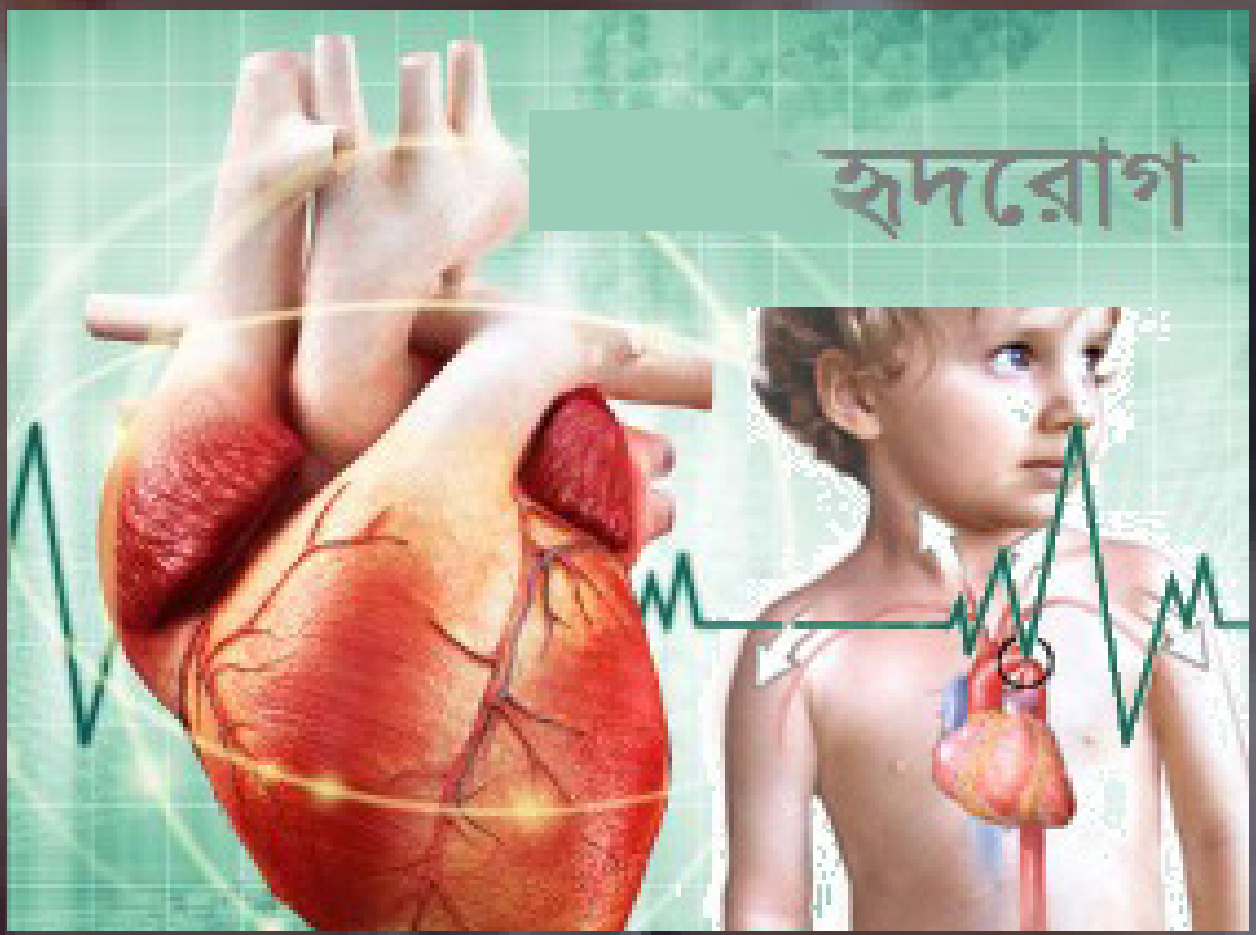

এছাড়াও আরো কিছু বিরল জন্মগত রোগ দেখা যায় যেমন, পালমোনারি স্টেনোসিস (pulmonary stenosis), অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস (aortic stenosis), মহাধমনীর অবস্থান পরিবর্তন (transposition of great arteries),ট্রাইকাসপিড এট্রেশিয়া (tricuspid atresia), কো-আর্কটেশন অব অ্যাওর্টা (co-arctation of aorta) ইত্যাদি। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করা গেলে সার্জারীর মাধ্যমে বেশির ভাগ জন্মগত রোগসমূহ ভালো হয়। যদিও পরবর্তীতে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শমত নিয়ম মেনে জীবন যাপন করলে এই সকল জটিলতা থেকে পরবর্তী জীবনে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে এখন পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলোজি ও পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারী বিশেষায়িত সেন্টার আছে। তাই বাচ্চার জন্মগত হৃদরোগের ত্রুটি দেখা দিলে সঠিক সময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে জীবন বাঁচানো এখন আর অসম্ভব নয়।

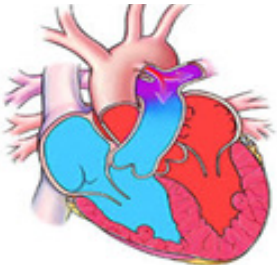

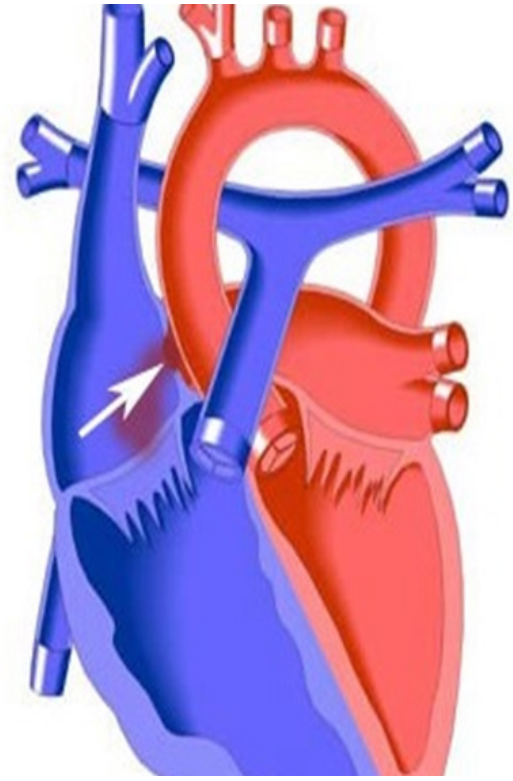

ডা: আসিফ ইয়াজদানী
মেডিকেল অফিসার
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঝটপট ওজন কমাতে চান? তাহলে পান করুন এই জাদুকরী ২ টি পানীয়

যাদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি তাদের সাধারণভাবেই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে নিজেদের ওজন কমিয়ে নিয়ে আসার। সেকারণে প্রয়োজন অনুযায়ী যা করার তা করতে অনেকেই প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন অনেকদিন ধরে একই নিয়ম মেনে চলতে হয়।

একই ডায়েট একইভাবে ব্যায়াম করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে হাল ছেড়ে দেন অনেকেই। আলসেমি এসে যায়। এই ধরণের আলসেমি দূর করার তো কোনো উপায় জানা নেই। তবে অলস ব্যক্তিদের জন্য সব চাইতে সহজ পদ্ধতিতে ঝটপট ওজন কমানোর গোপন উপায়গুলো বলে দিচ্ছি। তেমন কিছুই করতে হবে না। শুধু একটু কষ্ট করে বানিয়ে নিতে হবে ২ টি পানীয়। চলুন তবে দেখে নেয়া যাক উপায়গুলো।

পানীয়-১

উপকরণঃ -

১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো - ১ চা চামচ লেবুর রস - ২ চা চামচ মধু - ১ কাপ/ ২৩৭ মিলি লিটার পানি

পদ্ধতি ও ব্যবহারবিধিঃ - প্রথমে পানি ফুটিয়ে নিন। - এরপর একটি গ্লাসে দারুচিনি গুঁড়ো রেখে ফুটন্ত পানি তাতে ঢেলে দিন। এরপর গ্লাসে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিন। পানি পানের যোগ্য গরম হলে অর্থাৎ কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এলে এতে মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে দিন। ফুটন্ত গরম পানিতে মধু মেশাবেন না। এতে মধুর গুণ নষ্ট হয়। এরপর এই পানীয়ের অর্ধেকটা পরিমাণ রাতে ঘুমানোর আগে পান করে বাকি অর্ধেকটা ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে খালি পেটে বাকি অর্ধেকটা পান করে নিন। সকালে নতুন করে পানীয়টি গরম করার প্রয়োজন নেই। এভাবে নিয়মিত এই পানীয়টি পান করতে থাকুন। ব্যস, দেখবেন ওজন কমা শুরু করবে।

পানীয়- ২

উপকরণঃ -

১ টি মাঝারি আকারের আপেল - ৪৮৮ গ্রাম গাজর - ১ ইঞ্চি পরিমাণে আদা - ১ টি গোটা লেবুর রস

পদ্ধতি ও ব্যবহারবিধিঃ আপেল, গাজর ও আদা কুচি করে ব্লেন্ড করে নিন। - এরপর এতে মেশান লেবুর রস। দিনে ১ গ্লাস করে পান করুন এই পানীয়টি। কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফল পেয়ে যাবেন।

কেন কমবে ওজনঃ

অনেকেই ভাবতে পারেন পানীয় দুটি পান করলে ওজন কিভাবে কমবে? এরও ব্যাখ্যা রয়েছে। মধু একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা মেদ ক্ষয় করতে বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়াও মধু এবং দারুচিনি মিশিয়ে যখন এই পানীয় পান করবেন তখন এই পানীয়টি আপনার পরিপাক ক্রিয়া দ্রুততর করবে। এতে করে আপনার ওজন কমতে থাকবে। একই ব্যাপার ঘটে আপেল ও গাজরের জুসের ক্ষেত্রে। লেবুর সাইট্রিক এসিড মেদ কমাতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী। আপেল ও গাজর হজমক্রিয়া উন্নত করে। এতে করে ওজন কমে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মটরশুটি কেন রাখবেন

মটর শুটি খুবই সুস্বাদুকর এবং পুষ্টিকর একটি সবজি। সাধারণত এটি শীতকালে পাওয়া যায়। এটি একটি একবর্ষজীবী উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Pisum sativum । এটি ডাল জাতীয় উদ্ভিদ এবং গোলাকার বীজ সমৃদ্ধ।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কেন রাখবেন মটরশুটি তা জানাচ্ছেন আলফি শাহরিন-

ওজন কমাতে:

মটরশুটিতে ফ্যাট এবং ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। তাই বেশি খেলেও কম ক্যালরি পাওয়া যায় ফলে কম ক্যালরিতে অধিক সময় পেট ভরিয়ে রাখা যায়। এটি অধিক খাবারের চাহিদা থেকে দূরে রাখে। ওজন কমাতেও এটি খুবই সহায়ক।

পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে: মটরশুটিতে কেমোস্ট্রোল নামক পলিফেনল রয়েছে যেটি ক্যান্সার প্রতিরোধে খুবই সহায়ক। তাই পাকস্থলীর সুস্থতায় মটরশুটি খাওয়া খুবই জরুরি।

রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে: মটরশুটিতে রয়েছে অনেক অ্যান্টি-অ্যাক্সিডেন্ট যা দেহের অনেক খারাপ বিক্রিয়া প্রতিরোধ করে ফলে অনেক কঠিন রোগ থেকে আমরা বেঁচে যাই। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরণের মিনারেল যেমন-আয়রন, ক্যালসিয়াম, জিংক, কপার ইত্যাদি যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে:

মটরশুটিতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যেমন ফ্ল্যাভানয়েডস্, ক্যাটেসিন, এপিক্যাটেসিন, ক্যারোটিনয়েডস যা ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে এবং বুড়িয়ে যেতে বাধা দেয়।

বাতের ব্যাথায়:

মটরশুটিতে ভিটামিন-কে রয়েছে যা বাতের ব্যাথা প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই বাতের ব্যাথা প্রতিরোধে মটরশুটি খুবই সহায়ক।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে:

মটরশুটিতে রয়েছে অতিরিক্ত ফাইবার এবং প্রোটিন যেটি গ্লুকোজ পরিপাক হওয়ার সময় বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি এটি

কোনো অতিরিক্ত চিনি বহন করে না এবং রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ভূমিকা পালন করে।

চোখের উপকারিতায়:

এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ফ্ল্যাভনয়েডস্, বিটাক্যারোটিন, লুটেইন ইত্যাদি যা চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে।

চুল পড়া রোধে:

এতে ভিটামিন-সি রয়েছে যা কোলাজেন নামক প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে। কোলাজেন চুলের গোড়া শক্ত করে ফলে চুল পড়া কমে যায়।

হজম ক্ষমতা বাড়াতে:

এতে উচ্চমানের ফাইবার রয়েছে। তাই এটি হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

গর্ভবতী মায়ের জন্য:

এতে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ ফলিক এসিড যা বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই গর্ভবতী মায়ের অবশ্যই মটরশুটি রাখা উচিত তার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায়।

পুষ্টিগুণের দিক থেকে মটরশুটি খুবই উচ্চমানের একটি সবজি তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অবশ্যই এটি আমাদের রাখা উচিত। এই সবজিটি সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। তাই সারাবছরই মটরশুটি খাওয়া সম্ভব।

শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করবে যে খাবার

শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করবে যে খাবার

হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের জন্য আয়রন অত্যাবশ্যক। হিমোগ্লোবিন এক ধরণের প্রোটিন যা লাল রক্তকণিকার মধ্যে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। হিমোগ্লোবিন এর মতোই আর একটি উপাদান হচ্ছে মায়োগ্লোবিন যা মাংসপেশিতে থাকে।

এই মায়োগ্লোবিন এর উৎপাদনের জন্যও আয়রন প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষ মানুষের জন্য দৈনিক ৮ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন। আর মহিলাদের প্রয়োজন ১৮ মিলিগ্রাম। গর্ভবতী মহিলার দৈনিক ২৭ মিলিগ্রাম আয়রন প্রয়োজন।

শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে আয়রন অভাবজনিত অ্যানিমিয়া হয়। এই প্রকারের অ্যানিমিয়া হলে দুর্বল ও ক্লান্ত লাগার পাশাপাশি মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সাধারণত শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের আয়রনের ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে। এর ফলে মহিলাদের প্রিম্যাচিউর ডেলিভারি হতে পারে।

প্রাণিজ আয়রন ও উদ্ভিজ আয়রন এই দুই ধরণের আয়রন পাওয়া যায়। আয়রনের ঘাটতি পূরণের জন্য এই দুই ধরণের আয়রনই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এবার তা হলে জেনে নেই আয়রনের উৎসগুলো কি কি?

কলিজা

আয়রনের সবচেয়ে ভালো উৎস হচ্ছে কলিজা। এছাড়াও এতে ভিটামিন,খনিজ- লবণ ও প্রোটিন থাকে। গরুর কলিজাতে আয়রনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এক স্লাইস গরুর মাংসে ৫ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। যারা কলিজা খেতে পছন্দ করেন না তারা ডিম ও লাল মাংস খেতে পারেন। আধা কাপ ডিমের কুসুমে ৩ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে এবং ৩ আউন্স লাল মাংসে ২-৩ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে।

ডাল

আয়রনের একটি ভালো উৎস হল ডাল। এক কাপ ডালে ৬ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে এবং প্রচুর ফাইবার থাকে। এতে কোলেস্টেরল এর পরিমাণ কম থাকে এবং রক্তের সুগার লেভেল ঠিক থাকে।

পালংশাক

এক কাপ রান্না করা পালংশাকে ৬ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। এছাড়াও এতে প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ ও ই থাকে। রান্না করা পালংশাকের পুষ্টি উপাদান খুব সহজেই শরীর শোষণ করে নিতে পারে। বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই ভালো।

সিদ্ধ আলু

সিদ্ধ আলুতে ভিটামিন-সি ও বি, প্রচুর পটাশিয়াম থাকার পাশাপাশি উচ্চমাত্রার আয়রন থাকে। খোসাসহ একটি সিদ্ধ আলুতে ৩ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে।

ছোলা

এক কাপ ছোলাতে ৫ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে এবং এতে প্রোটিনও থাকে।নিরামিষভোজীদের জন্য ছোলা আদর্শ খাদ্য। ছোলা খুবই উপাদেয় খাবার। এটা সালাদ ও পাস্তার সাথেও ব্যবহার করা যায়।

ডার্ক চকলেট

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ডার্কচকলেট আমাদের জন্য ভালো। হ্যাঁ, ডার্ক চকলেট আয়রনের একটি ভালো উৎস এবং এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে।

কুমড়ার বিচি

এক কাপ কুমড়ার বিচিতে ২ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে। সুস্বাদু কুমড়ার বিচি রান্না করে, সালাদের সাথে, সিদ্ধ করে বা ভেজে বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। তাই কিছু কুমড়ার বীজ বাসায় রাখুন।

এছাড়াও আরো অনেক আয়রনসমৃদ্ধ খাবার আছে, যেমন- কাজু বাদাম, কিশমিশ, টমেটো, মটরশুঁটি, শিমের বিচি ইত্যাদি। আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরে চা বা কফি খাওয়া ঠিক নয়। শরীরে আয়রন যাতে ঠিকমত শোষিত হয় তার জন্য আয়রন জাতীয় খাবারের সাথে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার, যেমন- কমলা, স্ট্রবেরি, ব্রকোলি ইত্যাদি খেতে হবে। আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেলে যদি কারো সমস্যা হয় তাহলে আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

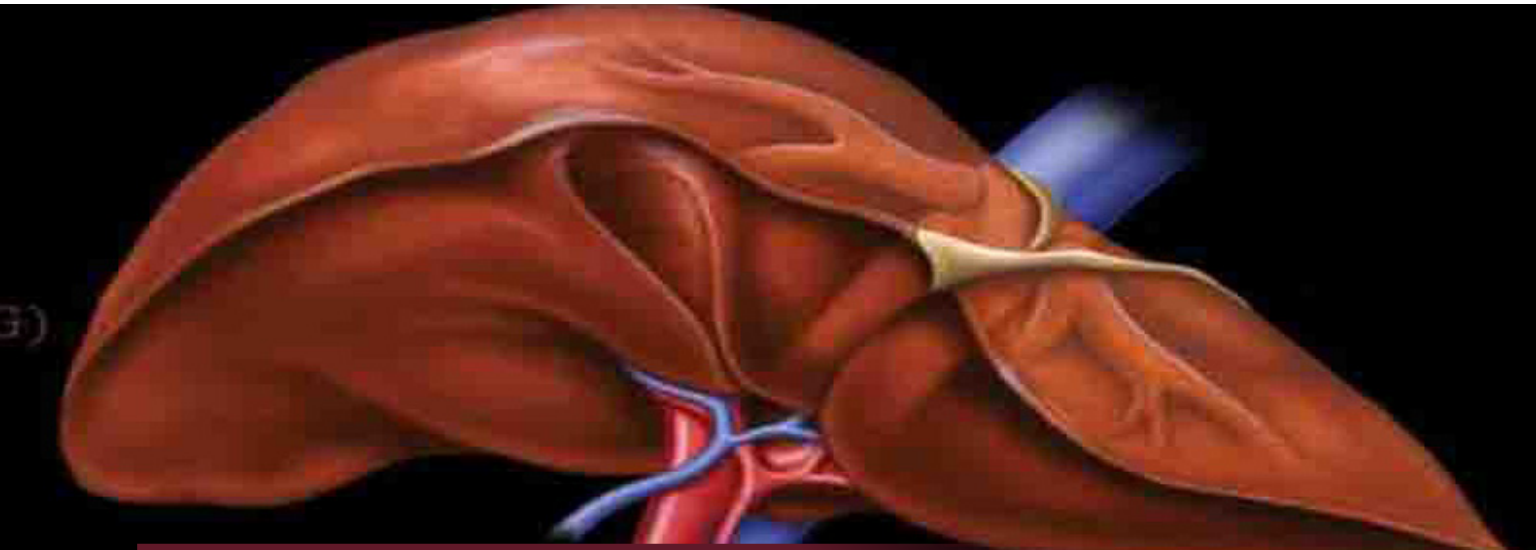

যে খাবার আপনার লিভারকে সুস্থ রাখবে

ত্বকের পরে লিভার মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার ওজন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষে প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন-

রসুন

রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়াম নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভারের পরিপাকে সহায়তা করে।

গ্রিনটি

গ্রিনটিতে থাকা ক্যাটেচিন নামক একধরণের উদ্ভিজ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

জাম্বুরা

জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎপাদক উপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে থাকে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

শালগম

শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে।

সবুজশাক

সবুজশাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

অ্যাভোকাডো

আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় অ্যাভোকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লুটাথায়ন নামক এক ধরণের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট তৈরি করে যা লিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে।

ব্রোকলি

ব্রোকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে।

লেবু

এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে।

হলুদ

মসলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরে হজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডিটক্স হিসেবে কাজ করে। মূল্যবান অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে হেপাটাইটিস-বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক।

আখরোট

আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা লিভার পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে।

আমলকি

আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

GoodGut®

Veg Caps

The most effective PROBIOTIC brand of Bangladesh

GUARANTEED

4 BILLION LIVE BACTERIA

℞

- Diarrhea & diarrhea related illness
- Adjuvant therapy with antibiotics
- Digestive discomforts like: IBS, Peptic ulcer disease, Ulcerative colitis, Intestinal dysbiosis etc.
- *Helicobacter pylori* Infection
- Lactose Intolerance
- Vaginal Infection

HERBAL DIVISION
RENATA LIMITED
Dhaka, Bangladesh

Please "Like" us on facebook.com/PurnavaLimited

Marketed by
PURNAVA LIMITED
A subsidiary of Renata Limited
e.purnava.com

রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা দূর করবে কাঁচাকলা

আমরা প্রতিদিন যা খাই তার উপরই নির্ভর করে আমাদের শরীরের সুস্থতা। শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ সবজির কোনো জুড়ি নেই। এমনি একটি সবজি কাঁচাকলা।

সারা বছর জুড়ে সুলভ কাঁচাকলা রক্তশূন্যতা দূর করে, হজমে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়াও এর রয়েছে নানারকম পুষ্টিগুণ।

প্রতি ১০০ গ্রাম রান্নাকরা কাঁচাকলার ক্যালরি ১১৬। ফ্যাট ০.৩ গ্রাম, শর্করা ৩১ গ্রাম, আমিষ ১.৩০ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.৩ গ্রাম, চিনি ১৪ গ্রাম, সোডিয়াম ৫ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৪৬৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৩৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ ১১২৭ আইইউ, ভিটামিন-সি ১৮.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-ই ০.১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-কে ০.৭ মাইক্রোগ্রাম, লৌহ ০.৬০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৩৪ মিলিগ্রাম, জিংক ০.১৪ মিলিগ্রাম, ফোলেট ২২ মাইক্রোগ্রাম, নিয়াসিন ০.৬৮৬ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.০৫৪ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০৫২ মিলিগ্রাম।

আসুন দেখে নিই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ কাঁচাকলার কিছু উপকারিতা–

- কাঁচাকলা শর্করা ও শক্তির উৎস। তাই এটি শরীরের দুর্বলতা দূর করে। ডায়রিয়ার জন্য কাঁচাকলা একটি ভালো পথ্য হিসেবে পরিচিত।
- কাঁচাকলা খনিজ পদার্থ যেমন- ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাসে সমৃদ্ধ হওয়ায় রক্তশূন্যতা দূর করে।
- এর খাদ্যআঁশ হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- পাকাকলার চেয়ে কাঁচাকলায় ভিটামিন-সি এর পরিমাণ বেশি। এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় ও জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করে।
- কাঁচাকলায় আছে প্রচুর ভিটামিন-এ যা শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভিটামিন-এ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের মেমব্রেনকে সুস্থ রাখে এবং ত্বক মসৃণ করে।
- কাঁচাকলা ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের ভালো উৎস। বিশেষ করে ভিটামিন বি-৬ কাঁচাকলায় অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় যা নিউরাইটিস, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা করে এবং শরীরে হোমোসিস্টিন কমাতে সাহায্য করে যা করোনারী ধমনীর ক্ষতি এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ।
- কাঁচাকলায় আরো আছে ফোলেট বা ফলিক এসিড, নিয়াসিন, রিবোফ্লাভিন এবং থায়ামিন। এগুলো শরীরে রক্তকণা তৈরিতে সহায়তা করে। গর্ভাবস্থায় নারীদের সুস্থ রাখে ফলিক এসিড।
- কাঁচাকলায় থাকা মিনারেল হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম হাড় মজবুত করে। আয়রন রক্তকণা তৈরিতে সহায়তা করে।
- কাঁচাকলায় থাকা পটাশিয়াম শরীরের হৃদস্পন্দনের সঠিকমাত্রা বজায় রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রা সঠিক রাখে এবং শরীরে অতিরিক্ত লবণের নেতিবাচক প্রভাব রোধ করে।
- কাঁচাকলা কিডনি এবং রেচনতন্ত্রের সমস্যা দূর করে।
- কাঁচাকলার মিনারেলস মাসিক ঋতুস্রাবের সময় রক্তকণা বৃদ্ধি করে শরীরের অস্বস্তি দূর করে।

যে স্বাস্থ্য সমস্যায় কলা ঔষধের চেয়েও ভালো

জেনে আশ্চর্য হবেন যে, বেশকিছু শারীরিক সমস্যায় কলা ঔষধের চেয়ে ভালো কাজ করে। কারণ এতে ভিটামিন, প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান অনেক বেশি পরিমাণে আছে। কলাতে থাকা উচ্চমাত্রার আঁশ আমাদের দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।

যেসব ক্ষেত্রে কলা ঔষধের চেয়ে ভালো ভূমিকা রাখে তা হলো

তাৎক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধিতে-

কলা খাওয়ার সাথে সাথে আমাদের দেহে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তির সঞ্চার হয়। তাই এই কারণে যারা ফুটবল, বাস্কেটবল এবং অন্যান্য খেলাধুলা করেন তারা তাৎক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কলা খান।

মানসিক চাপ কমাতে-

কলা মানসিক চাপ কমাতে বেশ ভালো ভূমিকা রাখে। এতে থাকা অ্যামাইনো এসিড আমাদেরকে শান্ত রাখতে এবং সময়কে আনন্দময় করতে পারে। এছাড়া কলাতে থাকা ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম আমাদের বিষণ্নতা দূর করতে সাহায্য করে।

হৃদরোগের জন্য ভালো-

কলা আমাদের হৃদস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ক্যালসিয়াম এবং খুব কম মাত্রায় লবণ থাকে যা উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

স্মৃতিশক্তির উন্নতিতে-

প্রতিদিন একটি করে কলা খেলে তা আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ ভালো ভূমিকা রাখে।

রক্তশূন্যতা পূরণে-

কলা সাধারণত রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর আয়রন যা রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

গর্ভাবস্থায়-

কলা গর্ভবতী নারীদের জন্য খুবই উপকারী। এইসময় কলা খেলে তা তাদের রক্তের শর্করার মাত্রা ঠিক রাখে এবং মর্নিং সিকনেস কমাতে সাহায্য করে। হরমোন নিয়ন্ত্রণে কলা আমাদের দেহের হরমোন নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পাকস্থলীর এসিড নিয়ন্ত্রণে-

এটা পাকস্থলীতে থাকা এসিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটা পাকস্থলীতে একটি বিশেষ মিউকাস বা পিচ্ছিল স্তর সৃষ্টি করে পাকস্থলীতে প্রদাহ বা ঘা হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে-

কলায় প্রায় সব ধরণের ভিটামিন থাকাতে তা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে-

কলাতে রয়েছে উচ্চমাত্রার আঁশ। তাই প্রতিদিন সকালে একটি করে কলা খেলে তা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

অতিরিক্ত পাকা কলার অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ

নাস্তায় প্রায়ই খাওয়া হয় যে ফলটি তা হল কলা। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ সদ্যপাকা কলা খেতে পছন্দ করেন। কলা অতিরিক্ত পেকে গেলে এর চামড়ায় কালো ছোপছোপ দাগ পড়ে। আর এই দাগের কারণে বেশিরভাগ সময় অতিরিক্ত পাকা কলা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি জানেন কি, এই অতিরিক্ত পাকা কলার রয়েছে অনেকগুলো স্বাস্থ্যগুণ?

* পুষ্টির পরিমাণ

প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম, ভিটামিন-বি এবং ফাইবারসমৃদ্ধ ফল হল কলা। কলা যখন অতিরিক্ত পেকে যায় এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

এর পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

* বুক জ্বালাপোড়া রোধ

কলাতে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-এসিড রয়েছে যা বুক জ্বালাপোড়া রোধ করে। বুক জ্বালাপোড়া করলে একটি কলা খান দেখবেন জ্বালাপোড়া অনেকখানি কমে গেছে।

* রক্তচাপ

কলা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এতে সোডিয়ামের পরিমাণ কম এবং পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এটি স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।

* সহজপাচ্য

অতিরিক্ত পাকা কলায় ফাইবারের পরিমাণ কমে যায়, যার কারণে এটি সহজে হজম হতে পারে।

* ক্যান্সার প্রতিরোধে

২০০৯ সালে জাপানিজ এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অতিরিক্ত পাকা কলাতে টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর রয়েছে যা শরীরের ক্যান্সারের কোষ ভেঙ্গে দেয়। এটি ক্যান্সার নিরাময় করে না তবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে।

* কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে

কলাতে ফাইবার রয়েছে যা প্রাকৃতিকভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে থাকে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা দূর করতে পাকা কলা খাওয়ার অভ্যাস করুন।

* রক্তস্বল্পতা দূর করতে

কলায় আয়রন রয়েছে যা রক্তকোষকে উজ্জীবিত করে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকে। যা রক্তস্বল্পতা দূর করে। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন একটি পাকা কলা।

আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান

সর্দিকাশি

শিশুর যদি সর্দিকাশি হয়ঃ

১. কয়েকটি তুলসী পাতা থেঁতো করে নিন। কচি বাচ্চাদের দিনে ৩বার ১ চা চামচ তুলসীর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে দিন।

২. দু চামচ নারকেল তেল গরম করুন । ১ বড় চামচ কর্পুর গুঁড়ো করে তেলে গলিয়ে নিন । ছিপি আঁটা বোতলে রেখে দিন। সর্দি তরল করতে শিশুর বুকে আর গলায় মালিশ করতে পারেন । এই তেল যে কোন গায়ের ব্যাথায় ব্যবহার করা যায়। সরষের তেলে মাষকলাই ফুটিয়ে তাতে একটু কর্পূর মিশিয়ে অল্প গরম অবস্থায় বুকে পিঠে মালিশ করাও ভালো । পুরানো ঘি মালিশ করা যায় ।

৩. পিপুলের গুঁড়ো বা যষ্ঠিমধু গুঁড়ো ১ থেকে ২ গ্রেন,মধু দিয়ে মেখে দিনে ২/৩ বার শিশুদের খেতে দেবেন ।বড়দের ৩-৪ গ্রেন দেবেন।

৪. বাসকপাতার রস,বড়দের ২ থেকে ৩ চা চামচ ,ছোটদের ১/৪ থেকে ১ চা চামচ ,মধু দিয়ে দিনে ২/৩ বার দেবেন।

৫. শুকনো বা খুসখুসে কাশিতে কফ বার করার জন্যে পাঁচন বা ক্বাথঃ

শুঁট ১ টি ,গোলমরিচ ১০ টি, তেজপাতা ৪ টি ,মিছরি গুঁড়ো ১ চা চামচ ; এগুলি একটু থেঁতো করে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে অল্প গরম অবস্থায় দিনে দুবার খাবেন ।

বড়দের যদি সর্দিকাশি হয়ঃ

৬. ২ গ্লাস জলে ১ মুঠো ইউক্যালিপটাসের পাতা ফুটিয়ে নিন।জল ফুটে ফুটে ১ গ্লাস হয়ে যাক। এই জলটা ছেঁকে চিনি মিশিয়ে নিন।দিনে ৩ বার করে এটা খান।

৭. সর্দিকাশির আর একটা ওষুধ হচ্ছে গুমা। এটা একটা বুনো গাছ –এর ফুলগুলো সাদা ঘন্টার মতো দেখতে। এর পাতা একটু হলুদ দিয়ে জলে ফুটিয়ে ,সেই ভাপ শ্বাস দিয়ে টেনে সর্দি তরল হয়, বসা সর্দি উঠে আসে।ভাপ বাড়াবার জন্যে কয়েকটা গনগনে পাথর জলে ফেলে দিন।

মাথায় সর্দি বসা (সাইনোসাইটিস / Sinusitis)

১. রেড়ির তেলে এক টুকরা হলুদ ভিজিয়ে সেটা পুড়িয়ে তার ধোঁয়ায় শ্বাস নিন।

২. কয়েকটি গোলমরিচ পুড়িয়ে তার ধোঁয়ায় শ্বাস নিন ।

৩. আধ কাপ উচ্ছের রসের সঙ্গে আধ কাপ পাতিলেবুর রস আর এক বড় চামচ মধু মিশিয়ে নিন। দিনে ৩ বার খান।

৪. কালো জিরে একটু থেঁতো করে কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে মাঝে মাঝে শুঁকুন।

গলা ব্যথা :

১. সমান সমান মধু আর আদার রস মেশান। ৩ ঘন্টা অন্তর অন্তর বড় চামচের এক চামচ খেলে খুব আরাম হয় ।

২. খানিকটা জল ফোটান।একটা পাতিলেবুর রস আর চিনি বা নুন মিশিয়ে গরম গরম খেয়ে নিন।

৩. এক গ্লাস দুধে ১ চিমটি গোলমরিচ গুড়ো আর ১ চিমটি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ফুটিয়ে গরম গরম খান।

পেটে খিঁচ ধরা, পেটে ব্যথা, কৃমি বা বদহজমের জন্যে

ধুতরোর পাতায় একটা ওষুধ আছে, যা পেটে খিঁচ ধরা, পেটে ব্যাথা কমায়।

১. ধুতরোর দুটো বা একটা পাতা বেটে সেটা ৭ বড় চামচ (১০০ মি:লি:) জলে এক দিন ভিজিয়ে রাখুন। শুধু বড়দের মাত্র ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর দেবেন।

সাবধানঃ মাত্রা যা দেয়া হল তার বেশী খেলে সমস্যা হতে পারে। ধুতরোতে মারাত্নক বিষ পাওয়া গেলে ব্যথার বড়ি খাওয়াই ভালো ।

২. জিরে সেকেঁ গুঁড়ো করে কুসুম গরম জলে মিশিয়ে ২ চা চামচ দিনে ৩ বার করে ২ দিন খাবেন । ব্যথা না কমলে ডাক্তার পরামর্শ নিন।

পাতলা পায়খানা

যদি পাতলা পায়খানা বেশী না হয়,আর জ্বর ,বমি, পায়খানা রক্ত বা শরীরে জলের অভাবের চিহ্ন না থাকে:

১. ভাত রান্না করার সময়ে বেশী করে জল দিন। বাড়তি ফ্যানাটা ছেঁকে ঠান্ডা করে ১ গ্লাস ফ্যানে ১ চিমটি নুন দিয়ে খাওয়ান ।

২. চাল সেঁকে সেঁকে কালো করে নিন । বেটে নিন । প্রতিবার পাতলা পায়খানা করার পর বড়দের ২বড় চামচ দেবেন । ছোটদের দেবেন না ।

৩. অল্প পাতলা পায়খানা ,দুধ চিনি ছাড়া কড়া চা লেবুর রস দিয়ে খেলে উপকার হয় ।শুধু বড়দের দেবেন ।

৪. পেয়ারা পাতা বেটে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো মেশান । ছেঁকে নিয়ে দিনে পাঁচবার ২ চা চামচ করে খাওয়ান । ৩ দিন দেবেন ।ছোটদের এর অর্ধেক মাত্রা দেবেন।

৫. অল্প পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা আম থাকে কিন্তু শরীরে জলের অভাবের কোনো চিহ্ন না থাকে কাঁচাকলা সেদ্ধ দেবেন।

৬. বটগাছের একটু সাদা দুধ (আঠা) খানিকটা জলে মিশিয়ে প্রতিবার পাতলা পায়খানা করার পর বড়দের দু চা চামচ আর ছোটদের এক চা চামচ দিন।

৭. একটা কচি ডালিম ছাড়িয়ে বেটে নিন ।দই বা ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুবার খাওয়ান ।

৮. পাকা বেলের শাঁস সেঁকে দিনে ৩-৪ বার খাওয়ান।

মস্তিষ্কের ওপর অদ্ভুত প্রভাব রাখতে পারে আদা

আপনি কি জানেন, আদা খাওয়ার পর আপনার ঘৃণার অনুভূতি কমে আসে?

আপনি ভাবতে পারেন আপনি একজন ভালো মানুষ। আপনি সবসময় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। অস্বাভাবিক, উদ্ভট কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। বিজ্ঞান কিন্তু অন্য কথা বলছে। আমাদের আবেগ, শারীরিক স্বাস্থ্য, অভ্যাস এমনকি খাবারও আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ফলে আমরা এমন সব সিদ্ধান্ত নেই যা আসলে স্বাভাবিক নয় মোটেই।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গবেষকরা দেখেন, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মানুষদের আদা খাওয়ানো হলে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা সাধারণত যেসব কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করি, আদা খাওয়ার পর সেসব কাজ করতেই আপত্তি অনেকটা কমে যায়। এমনকি তাদের ঘৃণার অনুভূতিও কমে। গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ফিজিওলজি জার্নালে।

সবাইকে একটি জিনজার ক্যাপসুল বা একটি সুগার পিল দেওয়া হয়। প্রথম গবেষণাটি করা হয় ২৪২ জনের ওপর। তাদেরকে কিছু জঘন্য ছবি দেখানো হয়, যেমন- পচা মাংসের ছবি থেকে শুরু করে কেউ টয়লেটে বমি করছে এমন ছবি। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় প্রতিটি ছবি দেখে তাদের কতটা ঘৃণা হয়েছিল।

বমি ভাব কমাতে খাওয়া যায় আদা বা পান করা যায় আদা চা। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয় গবেষণাটি করা হয় ৩০৬ জনের ওপর। এতে তাদেরকে কিছু কাজের নমুনা দেওয়া হয়, যেমন দূর সম্পর্কের ভাই-বোনের মাঝে বিয়ে হওয়া বা মর্গে থাকা লাশের চোখে স্পর্শ করা। এসব কাজে তাদের কতটা অস্বস্তি বা ঘৃণা হয় তার তথ্য নেওয়া হয়।

তৃতীয় গবেষণাটি দ্বিতীয়টির মতোই ছিল, তাতে ৪৯৭ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন। চতুর্থ গবেষণায় ৫০৪ জন মানুষ ছিলেন। তাদের কিছু কিছু কাজের নমুনা দেওয়া হয় ও তা ঠিক কি বেঠিক, তার বিচার করতে বলা হয়। এমন কাজের মধ্যে ছিল, সহপাঠীকে অকারণে চড় মারা, পরীক্ষায় নকল করা, বাবা-মায়ের সাথে ঝগড়া হয়েছিল বলে তাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা ইত্যাদি।

গবেষণায় দেখা যায়, যারা আদা দেওয়া ওষুধ খেয়েছিলেন তাদের ঘৃণার তীব্রতা কম হয় ও অনৈতিক কাজের জন্য অন্যকে তারা বিচারও করেন কম। তবে খুব বেশি অনৈতিক ও ঘৃণ্য কাজের প্রতি সবার অনুভূতি একই হয়।

গবেষকরা ধারণা করেন, যেহেতু আদা খেলে বা আদা চা পান করলে বমি বমি ভাব কম হয়, একইভাবে ঘৃণার অনুভূতিটাও কমে আসে। মূলত আমাদের পেটে বমির অনুভূতি না থাকলে ঘৃণা কম দেখা যায়। কিন্তু সামাজিকভাবে যেসব জিনিসকে আমরা বরাবরই ঘৃণা করে এসেছি, তার ওপর আদার কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

সূত্র: আইএফএলসায়েন্স

আদা খাওয়ার উপকারিতা

আদা খাবারে স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি আমাদের দেহের সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এছাড়াও কাঁচা আদায় রয়েছে দারুণ সব উপকারিতা।

খেতে একেবারেই ইচ্ছে হচ্ছে না? অসুস্থ বোধ করছেন খাবার দেখলেই? কোনো সমস্যাই নয়। খাওয়ার আগে ১ চা চামচ তাজা আদা কুচি খেয়ে নিন। মুখের রুচি ফিরে আসবে।

প্রতিদিন মাত্র ১ ইঞ্চি পরিমাণের আদা কুচি খাওয়া অভ্যাস সাইনাসের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

হাতে পায়ের জয়েন্টে ব্যাথা হলে সাহায্য নিতে পারেন আদার তেলের। খানিকটা অলিভ অয়েলে আদা ছেঁচে নিয়ে ফুটিয়ে নিন ৫ মিনিট। ঠান্ডা হলে ছেঁকে এই তেল দিয়ে ম্যাসাজ করুন হাতে পায়ের জয়েন্টে। আদার অ্যান্টিইনফ্লামেটরি উপাদান দূর করে দেবে ব্যথা।

বমি বমি ভাব হচ্ছে? কিংবা মাথা ঘুরানো? একটুখানি আদা স্লাইস করে লবণ দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিন। দেখবেন বমি ভাব একেবারেই কেটে গিয়েছে। হজমে সমস্যার কারণে পেটে ব্যাথা হলে আদা কুচি খেয়ে নিন। আদা পেটে গ্যাসের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে বেশ কার্যকরী। খাবারের পুষ্টি দেহে সঠিকভাবে শোষণ করার ক্ষমতা বাড়ায় আদা। তাই প্রতিদিন খুব সামান্য পরিমাণে হলেও আদা খাওয়া অভ্যাস করা উচিত সকলের।

বুকে সর্দি কফ জমে গিয়েছে? নিঃশ্বাস টানতে সমস্যা হচ্ছে? ২ কাপ পানিতে আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। পানি যখন অর্ধেক হয়ে আসবে জ্বাল হয়ে তখন ছেঁকে নামিয়ে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করে ফেলুন। বেশ আরাম পাবেন।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন/ সালাহ উদ্দীন

শীতে যে ৫ টক ফল অবশ্যই খাবেন

শীত এলে কিছু মৌসুমি ফলও চলে আসে বাজারে। এর মধ্যে কয়েকটি ফল বেশ লোভনীয়। দেখলেই জিভে সুড়ুৎ করে জল আসে। যেমন কুল বা বরই। আরও আছে পেয়ারা। ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ এসব ফল শীতে খসখসে হয়ে যাওয়া ত্বকের জন্য বেশ উপকারী। আর তাই সুযোগমতো এসব ফল খেতে ভুলবেন না।

এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাইরে থেকে যত্নের পাশাপাশি চাই ভেতর থেকে সুস্থতা। শীতে কিছু ফল আপনাকে সজীবতা ও সুস্থতা দেবে। শরীরে ফাইবার বা আঁশের ঘাটতি মেটাতে ও ভিটামিন 'সি'র জোগান দিতে শীতের সময় বেশি করে টকজাতীয় ফল খেতে পারেন। জেনে নিন এ মৌসুমের দারুণ পাঁচটি টক ফল ও এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে:

বরইঃ

হজমের জন্য এই ফল ভালো। এটি ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট-সমৃদ্ধ। ফ্লু, হাঁপানি, কোলন ক্যানসার ও বাতের ব্যথা সারাতে বরই বেশ উপকারী। বারডেম জেনারেল হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ পুষ্টি ও পথ্যবিদ শামছুন্নাহার নাহিদের তথ্য অনুযায়ী, বরইয়ে ভিটামিন 'এ', 'সি', ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়ামসহ আছে নানা কিছু। রোগ প্রতিরোধে যেমন

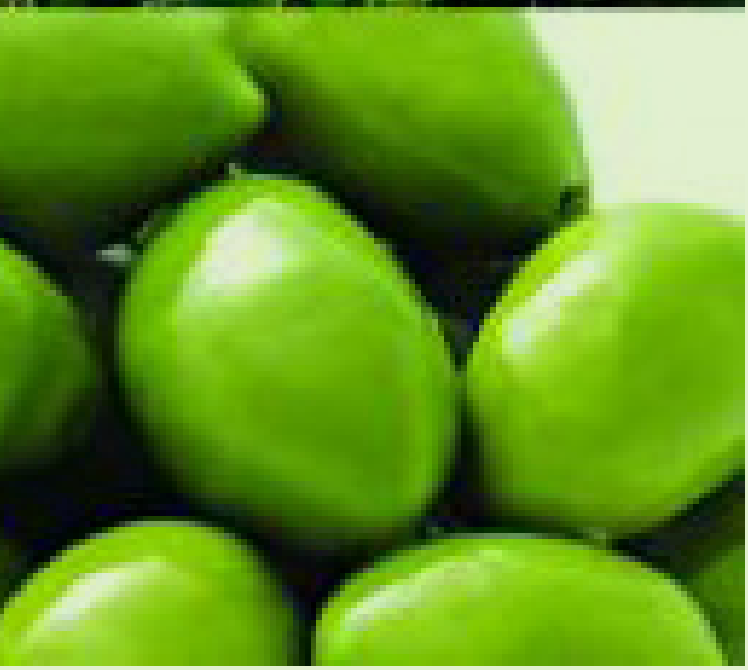

ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। বরই সবার জন্য ভালো হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য কিন্তু না। পাকা বরইয়ে চিনি থাকে, তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের পাকা বরই না খাওয়াই ভালো।

পেয়ারা:

শীতকালেও আপনি বাজারে পেয়ারা পাবেন। স্বাদ, পুষ্টিগুণ আর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রাখলে পেয়ারা খেলে প্রচুর লাভ। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পেয়ারা রাখা যেতে পারে। এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন 'সি' ও লাইকোপেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি। পেয়ারার বিশেষ পাঁচটি গুণের মধ্যে রয়েছে এটি ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, চোখের জন্য ভালো, পেটের জন্য উপকারী আর ক্যানসার প্রতিরোধী। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়, যা কমলালেবুর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। পেয়ারায় আছে ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স। এতে আছে যথেষ্ট পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ফলিক এসিড ও নিকোটিন এসিড। বয়সের সঙ্গে জড়িত নানা রোগ, যেমন: স্মৃতিভ্রংশ (অ্যালজেইমার), চোখে ছানি, আরথ্রাইটিস বা হাঁটুব্যাথা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

কমলা:

পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহারের তথ্য অনুযায়ী, বিটা ক্যারোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে কমলায়। এটি হজমশক্তি বাড়ায়, সর্দি-কাশি সারায়, মানসিক অবসাদ দূর করে। জ্বর ও ফ্লুর সময় কমলা খাওয়া ভালো। কোয়ার পাতলা ত্বকে আঁশ আছে বলে কোষ্ঠকাঠিন্যও কমাবে। কমলার রসে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম আছে। রক্তশূন্যতা ও জিভের ঘা সারাতেও কমলা উপকারী।

জলপাই:

শীতে প্রচুর জলপাই ওঠে বাজারে। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন 'সি', 'ই', লৌহ ও অসম্পৃক্ত চর্বি। ফলে এটি স্থূলতা কমায়, শরীরে উপকারী চর্বি বাড়ায়। বাতের ব্যথা, হাঁপানি উপশমে জলপাই কার্যকর। এই ফলের তেল বা অলিভ অয়েল হৃৎপিন্ডের জন্য উপকারী। হৃদ্‌রোগ ও কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে এই ভোজ্য অলিভ অয়েল বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আমলকী:

ভিটামিন 'সি'তে ভরপুর আমলকী খেলে দাঁত, চুল, ত্বক ভালো থাকে। এটি খাওয়ার রুচি বাড়ায়। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যাথা, অম্ল, রক্তস্বল্পতা, বমিভাব দূর করতে সাহায্য করে। কমলার তুলনায় আমলকীতে ২০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' আছে।

নিপাহঃ প্রাণঘাতী ভাইরাস

নাম করণ

১৯৭৮ সালের দিকে মালয়েশিয়ায় প্রথম নিপাহ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। দেশটির নেজেরি সেমভিলান রাজ্যের সুংগাই নিপাহ গ্রামে এ ভাইরাস পাওয়া যায় বলে এর নামকরণ করা হয় নিপাহ ভাইরাস।

এটা Paramyxoviridae পরিবারের অন্তর্গত একটি ভাইরাস। নিপাহ ভাইরাস আবিস্কার করেন
Dr. Chua Kaw Bing.

বাহক

টেরোপডিডি (Pteropodidae) গোত্রের বাদুড়ই (Pteropus vampyrus) নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক। এ বাদুড়ের আরেক নাম "লার্জ ফ্লাইং ফক্স"। অস্ট্রেলিয়া,বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ায় এর দেখা মেলে। আফ্রিকায়ও এটা নিপাহ ভাইরাস ছড়িয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে নওগাঁয় শুকরের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল নিপাহ।

সংক্রমণ

দক্ষিণ এশিয়ায় এ যাবৎ নিপাহ ভাইরাস ১৩ বার মহামারীর রূপ নিয়েছে। ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় নিপাহ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়ার পর সিঙ্গাপুরেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। IEDCR (Institute of Epidemiology Disease Control & Research) – তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রথম নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০০১ সালে মেহেরপুর জেলায়। এরপর ২০০৩ সালে নওগাঁয়, ২০০৪ ও ২০০৮ সালে রাজবাড়ীতে, ২০০৪ ও ২০১০ সালে ফরিদপুরে, ২০০৫ সালে টাঙ্গাইলে, ২০০৭ সালে কুষ্টিয়া, ঠাকুরগাঁওয়ে, ২০০৮ সালে মানিকগঞ্জে এবং ২০১১ সালে লালমনিরহাট ও দিনাজপুর। সাধারণত জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত এটি ছড়ায়।

যেভাবে ভাইরাস ছড়ায়

Pteropodidae গোত্রের বাদুড়ের মুখের লালা, মুত্র ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে। এর প্রাথমিক বাহক হিসাবে কাজ করে ঐ বাদুড়ের লালা ও মুত্র। খেজুরের কাঁচা রস , আংশিক খাওয়া ফলমুল ইত্যাদির মাধ্যমে এ ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসটি সংক্রামক হওয়ায়

তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে। বাদুড় খেজুরের রসের হাড়িতে সরাসরি মুখ ঢুকিয়ে দিতে পারে। আর ভাইরাস ওই রসের ভিতরেও বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। তখন রসের হাড়িটা হয়ে যায় আস্ত জীবানু।

রোগের লক্ষণ

মানব দেহে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর, সর্দি, তীব্র মাথা ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট ও বমির ভাব হয়।

* চরম পর্যায়ে মস্তিষ্কে প্রদাহ হলে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে রোগী আবল-তাবল বকতে পারে।

* খিঁচুনি ও অজ্ঞান হতে পারে।

আক্রান্ত হলে করণীয়

নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যথা সম্ভব দূরে থেকে সেবাশুশ্রূষা করে যেতে হবে।

* রোগীর ব্যবহৃত রোমাল, গামছা ও ব্যবহারের কাপড় চোপড়ের সংস্পর্শ পরিহার করতে হবে।

* রোগীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না।

*রোগীর কাছা কাছী গেলে ফিরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

* আক্রান্ত ব্যক্তির লালা ও হাচি-কাশি থেকে দুরে থাকতে হবে। তাৎক্ষনিক ভাবে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে।

সর্তকতা

সরাসরি নিপাহ ভাইরাস নিরাময়ে কোন ঔষধ বা প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:-

(১) পাখি দ্বারা আধা বা আংশিক ফল খাওয়া ও খেজুরের কাঁচা রস পান করবেন না এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরী করুন।

(২) যে কোন ধরণের ফলমুল পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোমত ধুয়ে খান।

(৩) আক্রান্ত মানুষের সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

(৪) আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

(৫) নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমন রোধে বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট মানুষকে আপাতত খেজুরের গুড় ও রস, আখের রস, পেঁপে, পেয়ারা, বরইসহ স্থানীয় ফল বা অর্ধেক খাওয়া ফল না খাওয়ার পরামর্শ দিন।

জনসচেতনতা সৃষ্টি

১. পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, টকশো ইত্যাদির মাধ্যমে

২. আঞ্চলিক লোক সঙ্গীতের মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে প্রচারণা চালানো

৩. স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করন: ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান,স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, গন্যমান্য ব্যক্তি ও এনজিও দের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে র‍্যালী, সমাবেশ, মাইকিং করা

৫. মসজিদ,মন্দির ও গির্জার ইমাম, পূরহিত ও ধর্ম যাজকদের মাধ্যমে খেজুরের কাঁচা রস না খাওয়ার জন্য প্রচারণা চালানো

৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ডা: হাফিজুর রহমান
এম.ও.সি.এস.
ফরিদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়

পেশির টান থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পেশির টান প্রচলিত একটি সমস্যা। আমাদের মধ্যে অনেকেই এ সমস্যায় ভুগে থাকেন। পেশির টানের কারণে আপনার সুন্দর একটি দিন নষ্ট হতে পারে, হয়ে উঠতে পারে অস্বস্তির কারণ। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কয়েকটি বিষয় মেনে চলতে পারেন-

পেশির টানের জন্য মূলত খাদ্যাভ্যাসকেই দায়ী করা হয়। সমস্যাটি থেকে মুক্ত হতে এজন্য খাবার গ্রহণের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে পটাশিয়ামযুক্ত খাবার অনেক সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়ামযুক্ত খাবার হিসেবে খেতে পারেন কলা ও মিষ্টি আলু। প্রোটিন যুক্ত খাবারও এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বেশিরভাগ সময় পর্যাপ্ত পানি পান করার প্রতি মনোযোগ দেই না। পানির ঘাটতির জন্যও পেশির টান মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য মাসল ক্র্যাম্প থেকে মুক্তি পেতে চাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

শীতকালীন সবজিগুলোতে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ম্যাগনেসিয়াম। তাই পেশির খিঁচুনি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে খেতে পারেন শীতকালীন সবজিও।

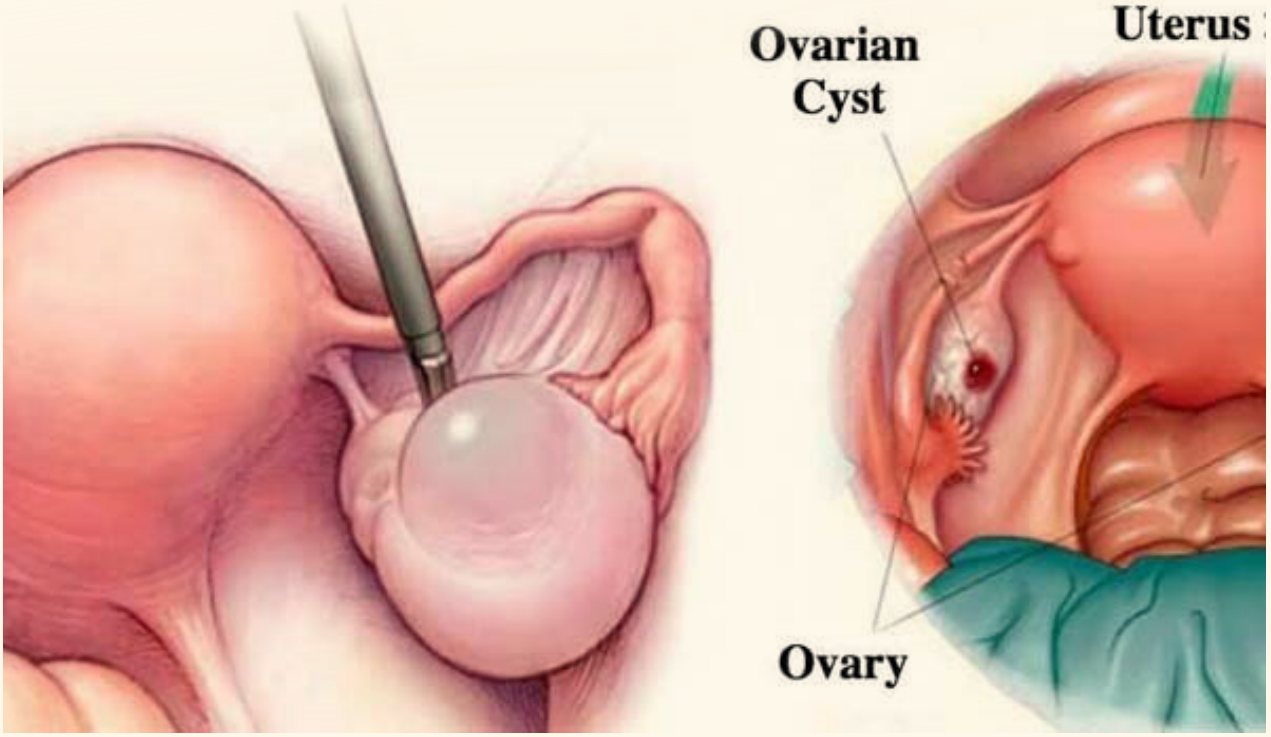

ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট : কী করা উচিত

ওভারিয়ান সিস্ট ও টিউমার দুটি আলাদা বিষয় হলেও অনেক সময় এ নিয়ে বিভ্রান্তি থেকে যায়, যার ফলে ওভারিতে ফাংশনাল/ফিজিওলজিক্যাল সিস্ট থাকলেও সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে রোগীরা দুশ্চিন্তায় ভোগেন। যদিও এই ধরণের সিস্টগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি মিলিয়ে যায়, দেখা যায় গ্রামে-গঞ্জে কিছু অসাধু ক্লিনিক ব্যবসায়ী এমন রোগীর অপারেশন করিয়ে তাদের প্রতারিত করে থাকে।

ওভারিতে ফাংশনাল সিস্ট তৈরির কারণ

শরীরে যদি কোনো কারণে হরমোনের তারতম্য হয় তবে ফাংশনাল বা ফিজিওলজিক্যাল সিস্ট তৈরি হতে পারে। এমন কিছু সিস্ট হচ্ছে ফলিকুলার ও কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট। শরীরে হরমোনাল ইমব্যালেন্স হলে ওভুলেশন বা ডিম্বস্ফুটন ব্যাহত হয়। নিয়মিতভাবে ডিম্বস্ফুটন না হলে ডিমের এই আবরণীর মধ্যে পানি জমে পরে ফলিকুলার সিস্টে পরিণত হয়।

ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্টের লক্ষণ

সাধারণত এরা Asymptomatic (অ্যাসিম্পটোমেটিক) হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না। তবে কিছু ক্ষেত্রে তলপেটে ব্যাথা হতে পারে।

বিভিন্ন রকম ওভারিয়ান সিস্টের মধ্যে ফলিকুলার সিস্ট সবচেয়ে কমন, যা পলিসিস্টিক ওভারিতে হয়ে থাকে। এই ধরণের রোগীরা অনিয়মিত মাসিক এবং বন্ধ্যাত্বের মতো সমস্যায় ভুগে থাকে। এছাড়া এই সিস্টের সাথে সম্পর্কিত অন্য যে সমস্যাগুলো থাকতে পারে তা হচ্ছে- অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি, শরীরে অবাঞ্ছিত লোম, রক্তের ব্লাড সুগার বা কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

ডায়াগনোসিস

ফাংশনাল সিস্টের এর সাইজ সাধারণত ৫-৭ সেমি হয়ে থাকে, ভিতরে ক্লিয়ার ফ্লুয়িড/পানি থাকে যা আল্ট্রাসাউন্ডের (Lower abdomen/TVS) মাধ্যমে ডায়াগনোসিস হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিউমার মার্কার যেমন- CA-125, MRI, CT scan দিয়ে এর প্রকৃতি (benign or malignant) সম্পর্কে ধারণা করা হয়।

চিকিৎসা

অন্যান্য ওভারিয়ান টিউমারের চিকিৎসা অপারেশন হলেও ওভারিয়ান সিস্টের চিকিৎসায় অপারেশন দরকার হয় না, হরমোনাল ওষুধ দেয়া যেতে পারে। সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো চলে যায়। এসময় অবশ্যই একজন গাইনোকোলজিস্ট এর তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। তবে অপারেশন লাগতে পারে, যদি-

ওভারিয়ান সিস্ট টুইস্ট/পেঁচিয়ে যায় অথবা Rupture (ফেঁটে) হয়। এক্ষেত্রে হঠাৎ করে পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং ইমার্জেন্সিভাবে চিকিৎসা করাতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে একই রকম থাকলে অথবা ধীরে ধীরে সাইজ বড় হলে কিংবা টিউমারের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে মহিলাদের ৪০ বছরের পর যেকোনো ওভারিয়ান সিস্ট/টিউমার গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা করাতে হবে, কারণ এক্ষেত্রে Malignancy বা ক্যান্সার হবার আশঙ্কা থাকে।

মনে রাখতে হবে, ওভারির ডারময়েড সিস্ট এবং চকলেট সিস্টের নামকরণে সিস্ট থাকলেও এগুলো ফাংশনাল বা ফিজিওলজিক্যাল নয়। এগুলো ওভারির প্যাথলজিকাল টিউমার, তাই এর চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন।

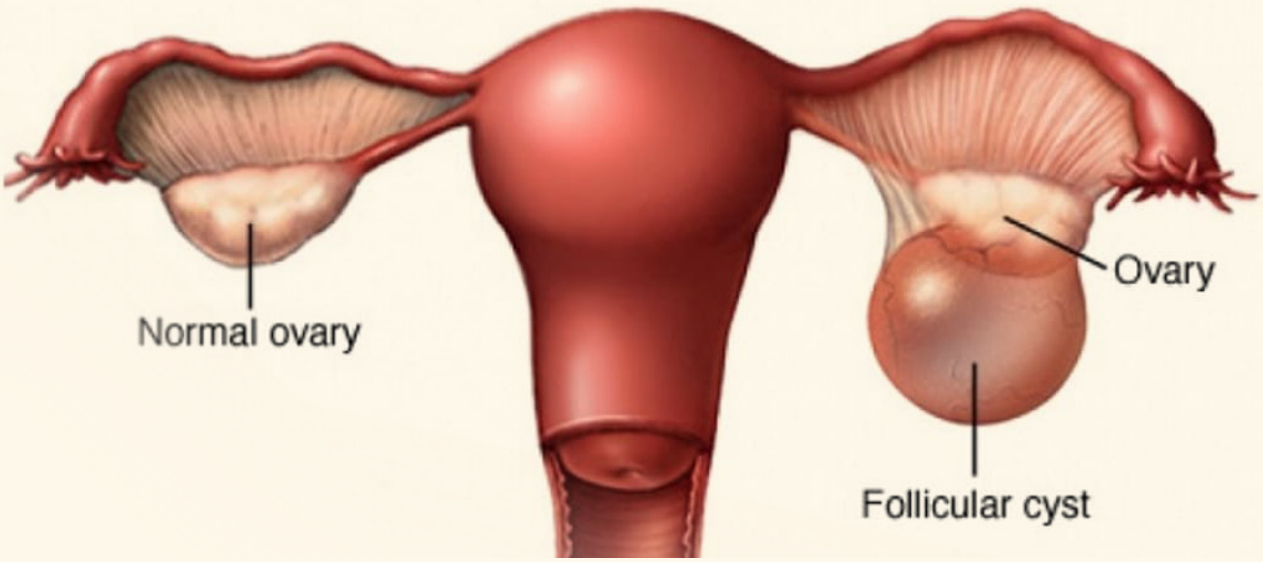

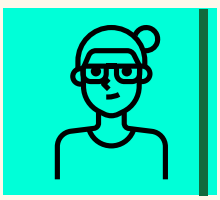

ডা. নুসরাত জাহান
এমবিবিএস, এফসিপিএস (অবস-গাইনি)
সহযোগী অধ্যাপক (অবস-গাইনি)
ডেলটা মেডিকেল কলেজ

মিথ্যে বলার অভ্যাস থেকে বাচ্চাকে বাঁচানোর রাস্তা

বাচ্চারা কোনও না কোনও সময় মিথ্যে কথা বলেই থাকে। তার সব ক'টা যে খুব সচেতন ভাবে, তা নয়। প্রথম প্রথম হয়তো খুব হালকা চালে কিছু মিথ্যে কথা বলতে পারে বাচ্চাটি। কিন্তু সেই মিথ্যে বলায় কোনও বাধা না পেলে, পরে বাড়তে থাকে মিথ্যের পরিমাণ। আর তখনই বিষয়টা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই মিথ্যে বলার প্রবণতা থেকে বাচ্চাকে থামানো উচিত।

যদি সেটা না হয়, তাহলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারণে-অকারণে মিথ্যে বলাটা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং সেটা তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য খুবই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে।বাচ্চাকে একেবারে প্রথম থেকেই মিথ্যে বলা থেকে আটকানোর কয়েকটি রাস্তা:

১। সত্যিটাই রোল মডেল:

মিথ্যে যে বলে, সে খারাপ, আর সত্যি যে বলে, সে ভালো। যে ভালো, তাকেই রোল মডেল করা উচিত। এরকম একটা ধারণা ছোটবেলা থেকেই তার মনে সৃষ্টি করে দিন। মিথ্যে যে বলে, তাকে কেউ পছন্দ করে না, তার সঙ্গে কেউ খেলে না, তাকে কেউ ভালোবাসে না- এমন একটা ধারণা বাচ্চার মনে গেঁথে দিন। এমন কোনও একজন কাল্পনিক চরিত্রের কথাও তাকে বলতে পারেন, মিথ্যে বলে যার জীবন খুব কষ্টে কাটে।

২। সত্যি বললে পুরস্কারঃ

বাচ্চা কেন মিথ্যে বলছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। এবং প্রথমেই সেই জায়গাটা তাকে দিতে হবে, যাতে সে সত্যি বলতে ভয় না পায়। তাকে বুঝিয়ে দিন, ঘটনাটা যত খারাপই হোক না কেন, সত্যি বলতে সে যেন কখনও না ভয় পায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পথ, সে যদি প্রথমে মিথ্যে বলে, তারপর সত্যিটা স্বীকার করে, তাহলে তাকে পুরস্কার দিন। সেক্ষেত্রে সত্যি বলার উৎসাহ বাড়বে।

৩। সাবধান করুনঃ

প্রথম বার মিথ্যে বললেই শাস্তি দেওয়ার রাস্তায় হাঁটবেন না। বরং তাকে সাবধান করুন। এবং এটাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন, সেই কথা না মানলে কী কী শাস্তি সে পেতে পারে। যেমন ধরুন আগামী ছুটিতে তাকে নিয়ে হয়তো কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা আছে। মিথ্যে বললে, সেটা বাতিল হয়ে যেতে পারে- এমন শাস্তির আভাস দিয়ে রাখুন।

৪। ফল কী কী হতে পারেঃ

সাবধান করার পরেও বাচ্চা আবার মিথ্যে বললে, তাকে শাস্তি দিন। সেক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তির কোনও প্রশ্নই উঠছে না। অতিরিক্ত বকাবকিও তার ওপর মানসিক চাপ তৈরি করতে

পারে। সেক্ষেত্রে তার খুব পছন্দের কোনও জিনিস (খেলনা, বা রংপেন্সিলের সেট) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার থেকে দূরে পাঠিয়ে দিন। প্রথমে একদিনের জন্য। কিন্তু মিথ্যে বলার পুনরাবৃত্তি হলে দু দিনের জন্য- এইভাবে এই শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে পারেন।

৫। বিশ্বাস ফিরিয়ে আনুনঃ

মিথ্যে বলার পর সে যদি সত্যিটা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাকে যতটা পুরস্কার দেবেন বলে জানিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি কিছু দিন। তাতে তার বিশ্বাস বাড়বে। সে ভালো দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে।

৬। বিশেষজ্ঞের পরামর্শঃ

যদি দেখেন কোনও ভাবেই বাচ্চার মিথ্যে বলার অভ্যাস বন্ধ করা যাচ্ছে না, তাহলে মনোবিদের পরামর্শ নিন। কারণ তিনি বলতে পারবেন, কোন থেরাপির মাধ্যমে কীভাবে তার মিথ্যে বলার অভ্যাস বন্ধ করা যায়। তবে বিষয়টি খুব বাড়াবাড়ির জায়গা গেলেই এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হবে।

ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর কারণে যে যে ক্ষতি হয়

দ্রুত গতির জীবনে অনেকেই নিজেদের খাবারের দিকে সেভাবে নজর দিতে পারেন না। কোনটা স্বাস্থ্যকর, কোনটা অস্বাস্থ্যকর- সেটা না ভেবেই তাঁরা খাবার খান। আর এর মধ্যে অনেকগুলোই শেষ পর্যন্ত শরীরের জন্য মোটেই উপকারী নয়, বরং মারাত্মক ক্ষতিকারক। এই তালিকায় একেবারে প্রথম দিকে থাকবে ইনস্ট্যান্ট নুডলস। সময়ের অভাবেই হোক বা স্বাদ পছন্দ বলেই হোক- অনেকেই নিয়মিত এই ইনস্ট্যান্ট নুডলস দিয়ে পেট ভরান। কিন্তু এর ফলে শরীরের যা যা ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁরা মোটেই সচেতন নন। ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর কারণে কী কী ক্ষতি হতে পারে, দেখে নেওয়া যাক:

১। ফাইবার আর প্রোটিন নেই

এইধরণের নুডলস-এ ফাইবারের পরিমাণ খুব কম। এবং এতে প্রোটিনের মাত্রাও কম। ফলত এই জাতীয় নুডলস ওজন বাড়ায়। এবং ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্যা হিসেবে হাজারো জিনিস হাজির হয়।

২। মেটাবলিক সিনড্রোম

পরিসংখ্যান থেকে দেখা গিয়েছে যাঁরা সপ্তাহে অন্তত একবার ইনস্ট্যান্ট নুডলস খান, তাঁরা এই সমস্যায় ভোগেন মারাত্মক ভাবে। ফাস্ট ফুড-এর গোত্রের মধ্যে যাঁরা অন্য খাবার খান, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা ততটা নয়, যতটা ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর ক্ষেত্রে হয়। পুরুষদের থেকে মহিলাদের এই সমস্যা অনেকটাই বেশি ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর কারণে।

৩। ক্যান্সারের আশঙ্কা

ইনস্ট্যান্ট নুডলস হজম হতে অনেকটা সময় নেয়। যদি তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়, তাহলেও বিপদ আছে। সেক্ষেত্রে ব্লাড সুগারের পরিমাণ এবং ইনসুলিনের পরিমাণও গন্ডগোল করে দিতে পারে এটি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই নুডলস হজম হতে দীর্ঘ সময় নেয় এবং তাতে বিপদ বাড়ে। কারণ সেক্ষেত্রে শরীরের মধ্যে টক্সিক পদার্থ অনেক বেশিক্ষণ ধরে এর থেকে নির্গত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের বলে বিউটিলেটেড

হাইড্রক্সিঅ্যানিসোল এবং টি-বিউটিলহাইড্রোকুইনন সেই মারাত্মক ক্ষতিকারক দু'টি যৌগ শরীরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থাকে। এই দু'টিই ক্যান্সারের মতো অসুখ ঘটাতে পারে শরীরে।

৪। হৃদরোগের আশঙ্কা

ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এর মধ্যে লবণের পরিমাণ অনেকটাই বেশি এবং এই লবণের বেশির ভাগটাই সোডিয়াম। ফলে যাঁরা বেশি মাত্রায় এই জাতীয় নুডলস খান, তাঁদের শরীরে লবণের মাত্রা বেড়ে যায়, এবং সেই কারণে বাড়তে থাকে রক্তচাপ। তাই ইনস্ট্যান্ট নুডলস সরাসরি ক্ষতি করে হৃদযন্ত্র বা হার্টের।

৫। ভ্রূণের ক্ষতির আশঙ্কা

যদিও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের এই জাতীয় ইনস্ট্যান্ট ফুড বা ফাস্ট ফুড খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু যাঁরা না জেনে গর্ভাবস্থায় এই জাতীয় নুডলস খান, তাঁদের ভবিষ্যৎ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এমনকী ভ্রূণ নষ্টও হয়ে যেতে পারে ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এ থাকা টক্সিক বা বিষাক্ত পদার্থের কারণে।

৬। ওবেসিটির আশঙ্কা

ইনস্ট্যান্ট নুডলস-এ থাকে মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (এমএসজি)। অনেক ইনস্ট্যান্ট খাবারেই এই যৌগ ব্যবহার করা হয়। খাবারের গন্ধ এবং স্বাদ ভালো করার জন্য ব্যবহার করা হয় এই যৌগটি। এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকারক, নাকি ক্ষতিকারক নয়- তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনও বিতর্কই নেই- এমএসজি দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে গেলে ওজন বৃদ্ধি হয়। এই কারণে এমএসজি চিকিৎসকরাও সেই সব রোগীদের দেন, যাঁরা দুর্বলতা বা কম ওজনের সমস্যায় ভুগছেন। কারণ ওষুধ হিসেবে এই যৌগটি ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। আন্দাজ করাই যায়, কেন ইনস্ট্যান্ট নুডলস দীর্ঘদিন খেলে ওজন বাড়ে।

বাচ্চার শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা নির্ধারণ করে!

বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্য অনেক পুষ্টির প্রয়োজন, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যদি দেখেন যে আপনার বাচ্চার গায়ে চুলকানি হচ্ছে বা মাঝে মাঝেই সর্দি বা পেটে ব্যথা, তাহলে একটু ভাল করে ওর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দিকে নজর দিতে হবে। চট করে রোগের শিকার হওয়া, শুধু আপনার বাচ্চার পড়াশোনার ক্ষতি করবে, তা নয়, এটা আপনার বাচ্চাকে দুর্বল ও রোগ প্রবণ করে তুলবে।

সাম্প্রতিক কালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৮১% বাড়ন্ত বাচ্চা যথেষ্ট মাত্রায় লোহা, ভিটামিন এ এবং সি পাচ্ছে না। এই অভাব, শরীরকে দুর্বল করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম করে। এর কারণে আপনার বাচ্চা ঋতু পরিবর্তনের সময়েও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

ভিটামিন এ

অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য শরীরের ভিটামিন এ-র প্রয়োজন হয়। এর অভাব বাচ্চাদের প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষয় করে। এখান থেকেই সংক্রমণ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা শুরু হয়। খেয়াল রাখুন যাতে বাচ্চাদের খাবারে ঠিক মাত্রায় ভিটামিন এ থাকে।

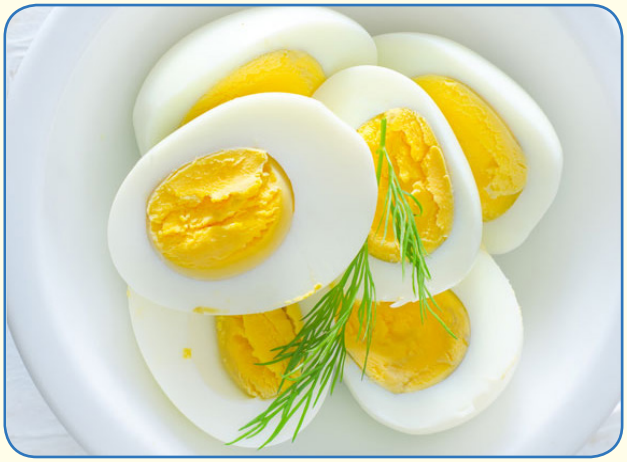

ভিটামিন বি

ভিটামিন বি-র প্রয়োজন হয় সাদা ব্লাড কোষের, শরীরের যত্নের জন্য। বিশেষ করে ভিটামিন বি১২, বি৯ ও বি৬-র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শরীরে লিম্ফোসাইটের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য। এই ভিটামিনগুলো শরীরকে শক্তিশালী বানায় ও সংক্রমণ থেকে বাচ্চাদের বাঁচায়।

ভিটামিন সি

ভিটামিন সি-র অভাব বাচ্চাদের শরীর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। T-Cell ও ফ্যাগোসাইট (Phagocyte)

হল রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কোষ। যথেচ্ছ পরিমাণে ভিটামিন সি নিলে এই কোষগুলোর সৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, যা খুবই উপকারি। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার লড়াইয়েও ভিটামিন সি-র খুব দরকার। এইভাবেই এটা অনেক সংক্রমণও রোধ করতে পারে।

লোহা

লাল রক্তের কোষগুলোর লোহার প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিয়া দূর করতে নিউট্রোফিলের দরকার। লোহার অভাবে শরীরে T-Cell এর সংখ্যা কম হতে পারে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, লোহার অভাবে শরীরের সার্বিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যেতে পারে।

জিংক

জিংক, শরীর ঠিক রাখতে ও রোগ প্রতিরোধে (নিউট্রিফিলস ও মারণ কোষ) সাহায্য করতে খুব কার্যকরি। জিংকের অভাবে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরীর মাত্রা কমিয়ে দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এর অভাবে।

ভিটামিন ই

বাচ্চাদের শরীরের সংক্রমণ রোধে এই ভিটামিনের মধ্যে উপস্থিত এন্টিঅক্সিডেন্টের প্রয়োজন খুব। সূর্যমূখী ফুলের বীজ ও বাদামে এটি যথেচ্ছ মাত্রায় পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি৬

শরীরের প্রায় দুশোর ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে এই ভিটামিনটির ব্যবহার দেখা যায়। এটা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় খুব কাজে লাগে। কলা ও ছোলায় এটি বেশি পাওয়া যায়।

সেলেনিয়াম

সেলেনিয়াম আরেক অতি আবশ্যক পুষ্টিকর উপাদান, যার খুব দরকার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে। এটার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় পাওয়া যায় বার্লি, ব্রাজিল বাদাম ও রসুনে।

পিঠ ও কোমর ব্যথা কমানোর সেরা পানীয়

আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বেশিরভাগ কাজই মেশিনের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। ফলে কাজের ধরণ আগের চেয়ে অনেকটাই বদলেছে সন্দেহ নেই। এখন কায়িক শ্রমের চেয়ে মাথার কাজ অনেক বেশি করতে হয়। এবং তা করতে হয় এক জায়গায় বসে। প্রযুক্তির বদান্যতায় কিছু কাজ বাদে প্রায় সবটাই হয়েছে কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করা ছাড়া উপায় থাকে না। আর এসব কারণেই স্পন্ডিলাইটিস, গা-হাত-পা ব্যথা, বাত, গাঁটে ব্যাথা ও অন্যান্য সমস্যা আজকের দিনে খুব কমন হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ঘরেই এইসবে ভোগা মানুষ রয়েছেন। তবে রোগ থাকলে তা সারানোর ঔষধও রয়েছে। নিচের স্লাইডে দেখে নিন, কোন কোন পানীয় পিঠ ও কোমরের ব্যাথাকে সহজেই উপশম করতে পারবে।

স্ট্রবেরি

স্ট্রবেরিতে তৈরি পানীয় ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসে ঠাসা। এটি আপনার এনার্জির মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। এর পাশাপাশি ব্যাথা কমাতেও এটি বিশেষ উপযোগী।

আনারস

আনারসে রয়েছে নানা ধরণের ব্যাথা উপশমকারী উপাদান ‘ব্রমেলিন’। এর তৈরি পানীয় শরীরের ব্যাথা উপশমে দারুণ সাহায্য করে।

ট্রপিক্যাল পানীয়

যদি আপনি বাতের মতো সমস্যায় ভোগেন, তাহলে নারকেলের দুধ, আম, লেবু ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি পানীয় দারুণ উপকার দেবে।

আঙুর

আঙুরের সঙ্গে পার্সলে পাতা দিয়ে তৈরি পানীয় হাড়ের ক্ষয় রোধ করে ও হাড়কে শক্ত করে। এছাড়াও যেকোনও ব্যাথাকে কমাতে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে এই পানীয়।

পালং শাক

পালং শাক সেদ্ধ করে তাতে আদা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে খান। এতে থাকা ভিটামিন কে পিঠের ব্যথা দূর করে, ও আদা মাংসপেশীকে রিল্যাক্স করে।

কলা

কলার সঙ্গে মধু মিশিয়ে পানীয় তৈরি করে খেতে পারেন। হজম ঠিক করে, নানা ধরণের ব্যথা কমাতে এটি দারুণ কাজ দেয়।

দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে

সাধারণত শরীরের বাকি অঙ্গের যেভাবে খেয়াল ও যত্ন নিই আমরা সেভাবে দাঁতের ক্ষেত্রে তা করি না। ছোটবেলা থেকেই নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাস মেনে চলতে পারলে দাঁতের ক্ষয় যেমন রোধ করা সম্ভব তেমনি দাঁতের অন্যান্য সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। সঠিক ভাবে দাঁতের ব্যাথা ভাল না করলে দাঁত এবং মুখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ছোটদের এবং বড়দেরও দাঁতের সুরক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এমন অনেক উপায় রয়েছে যে গুলো মেনে চলতে পারলেই দাঁতকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। অন্যথায় দাঁতের ব্যথা, ক্ষয় মাড়ি থেকে রক্তপাত প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক নজর দেখে নেওয়া যাক ঠিক কী কী ভাবে আমরা আমাদের দাঁতকে সুরক্ষিত রাখতে পারি।

নিয়মিত ব্রাশ করা

দাঁতের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়মিত মেনে চলা উচিৎ তা হল প্রত্যহ দু'বার ব্রাশ করা আবশ্যক।সকালে ব্রাশ করার পাশাপাশি রাতেও খাবার পরে ব্রাশ করা আবশ্যক এতে দাঁতের মাড়ি, দাঁত দুটোই ভাল থাকে। পাশাপাশি ব্যকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

ভাল করে মুখ ধোয়া

যেকোন খাবার খাওয়ার পরেই মুখ জল দিয়ে ভাল করে ধোয়া উচিৎ। মিষ্টিজাত বিভিন্ন খাবার, চকলেট, প্রভৃতি খাওয়ার পরে মুখে জল নিয়ে কুলকুচি করা উচিৎ। তা না হলে দাঁতের মধ্যে লেগে থাকা খাবারের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ বেড়ে যায়।

নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা

দাঁত এবং দাঁতের সুরক্ষার জন্য নিয়মিত দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। প্রয়োজনে দাঁতের জন্য যা যা করণীয় তা চিকিৎসকের কথা মতো মেনে চলা উচিৎ। অনেক সময় ব্রাশ করার পরেও দাঁতের ফাঁকে খাবার আটকে থেকে যায়। তার সঠিক পরিচর্যার জন্য দাঁতের পরীক্ষা করনো জরুরী।

পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া

খাবারের তালিকায় বিভিন্ন ধরণের খাবার রয়েছে যেগুলো দাঁতের সুরক্ষার জন্য ভাল। যে সমস্ত ফল এবং সবজিতে ফাইবার রয়েছে সেই খাবারগুলো দাঁতের জন্য ভাল। এছাড়াও ডিম, দুধ, বাদাম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য দাঁতের সুরক্ষায় এবং এনামেল তৈরিতে সাহায্য করে।

ঠান্ডা পানীয় খাবার সময় স্ট্র ব্যবহার করা

যে কোন ধরণের ঠাণ্ডা পানীয় খাবার সময়ে স্ট্র ব্যবহার করা উচিৎ। বাজার থেকে যে সমস্ত পাণীয় আমরা কিনে খাই তা খাওয়ার সময়ে স্ট্র ব্যবহার করলে দাঁতের ক্ষয় অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। কেননা স্ট্র দিয়ে ঠান্ডা পানীয় খাবার সময়ে তা সরাসরি দাঁতের সংস্পর্শে আসে না তাই এই সুরক্ষা পাওয়া যায়।

ওষুধ খাওয়ার পরে ব্রাশ করা

এই ছোট্ট বিষয়টি আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই । যে সমস্ত তরল ওষুধ বা সিরাপ রোগ নিরাময়ের জন্য আমরা খাই অথবা আমাদের বাচ্চাদের খাইয়ে থাকি তার মধ্যে চিনির উপাদান বেশি থাকে যা দাঁতের ক্ষয় সহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই আপনার বাচ্চাকে এই ধরণের কোন ওষুধ খাওয়ানোর পরেই ব্রাশ করাতে ভুলবেন না।

Dhaka Board Reg. No. 6579/2002

Cambridge Center No. BD028

EUROPEAN STANDARD SCHOOL (ESS)

An English Medium School from PG-A Level (Cambridge Curriculum)

Established in 2001
Registration No.: 6579/2002

Application forms for 2018-2019 session are available on website: www.essedu.info and also in all campuses

Corporate Office:
House # 31/A,
Road # 08
Dhanmondi, Dhaka
(Near Lt. Sheikh Jamal Dhanmondi Club Ltd.)

Highlights

- Colourful play area
- International curriculum
- Air conditioned classrooms with generator backup
- Well equipped library & Science Labs
- Innovative and effective teaching technologies
- Use of multimedia for teaching

Club Facilities

- Sports Club
- Cultural Club
- Debate Club
- German Language Club
- Photography Club
- Art and Craft Studio

Specialities

- Developing reading and speaking skills
- Developing interactive and communication skills
- Outshine the Creativity of your child
- Grooming your child's cultural skills

Contact Information

Dhanmondi Campus	01713083685 01713084442 01755565762
Mirpur Campus	01713080269
Wari Campus	01771565885
Barishara Campus	01730716268

--জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ শাহলা খাতুন

ঘরে বাইরে সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে-

সবুজ সিলেটের শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন সাইকেল চালিয়ে। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম। পারিবারিক আভিজাত্য, ধর্মীয় অনুশাসন আর আধুনিকতায় বেড়ে উঠেছেন। পারিবারিকভাবে ছেলেমেয়ের মধ্যকার তফাৎ বলতে কিছু ছিলনা। সকলেরই ছিল সমান সুযোগ আর অধিকার। মুসলিম বনেদী পরিবারের মেয়ে হিসাবে একদিকে যেমন নিয়েছেন নামাজ কোরানের তালিম, পড়েছেন বাংলা তেমনি পাড়াময় দাপড়ে বেড়িছেন, হকি- ডাংগুলি খেলেছেন ছেলেদের সাথে। পিতামহ খান বাহাদুর ছিলেন সে সময়কার গ্রাজুয়েট। আর ফুফু সিলেট শহরের প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে। বাবা সেই ১৯৪৫-৪৭ সনের এম.এ, এল.এল.বি পেশায় ছিলেন এডভোকেট। তাছাড়া তিনি ছিলেন জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সেবক। মাও ছিলেন সমাজসেবী। কাজ করে গেছেন নারী উন্নয়নে। ১৪ ভাইবোনের পরিবারে প্রত্যেকেই স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত। আজ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশে - বিদেশে স্ব-স্ব প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠায় অর্জন করেছে সম্মান ও প্রতিপত্তি। পারিবারিক শিক্ষায় নিজেদের তৈরী করেছেন যোগ্য মানুষ হিসাবে। নিজ যোগ্যতায় কাজ করে যাচ্ছেন সুনামের সাথে। কেউ বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন , কাজ করছেন। কেউ কেউ জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন দেশের জাতীয় সংসদের মন্ত্রীসভার একজন হিসাবে,। কেউ কাজ করছেন কখনও চিকিৎসক হিসাবে, কখনও চিকিৎসক তৈরীর কারিগর হিসাবে। রত্নগর্ভা জননীর ১৪ জন সন্তানই বাংলাদেশের জন্য অমূল্য সম্পদ। ধন্য জননী হে। ভাইবোনদের মধ্যে আছেন আমাদের দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, দেশের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মুমেন এবং আমাদের আজকের অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ড: শাহলা খাতুন। যিনি দেশের চিকিৎসা খাতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমানে কর্মরত আছেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের গাইনী ও অবস বিভাগের চেয়ারম্যান এবং

গ্রীন লাইফ হাসপাতালের চেয়ারম্যান হিসাবে। এই গুনীজনের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয় তার শৈশবে বেড়ে উঠা আর কর্মজীবন নিয়ে। সাথে আলোচনায় উঠে আসে দেশের বর্তমান চিকিৎসা খাতে বিরাজমান সমস্যা এবং তার সমাধান। সাক্ষাৎকারের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ-

আমার স্বাস্থ্য: আপনার জন্ম , শৈশব বেলার সময়টা কেমন কেটেছিল ?

ডা. শাহলা খাতুন: আমার জন্ম সিলেট শহরে । যে বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম সে বাড়ী এখনও আছে। বর্তমানে হাফিজ কমপ্লেক্স নামে পরিচিত। আমাদের বাড়ী একনামেই সকলেই চিনতো । আব্বা দাদাদের সময় থেকেই এ বাড়ী পরিচিত। মুহিত ভাই থেকে শুরু করে (আমরা ছোটভাই বলেই ডাকি) আমাদের ১৪ ভাইবোনের মধ্যে বড় দুজন ছাড়া বাকী সবারই জন্ম এই বাড়ীতে। বেড়ে উঠা তথা শৈশব কৈশোর এই শহরেই হাফিজ কমপ্লেক্সে । পারিবারিক ঐতিহ্যে আর অনুশাসনে এবং প্রগতিশীল পারিবারিক পরিমন্ডলে ১৩-১৪ জন ভাইবোনের বড় সংসারে হাসি আনন্দের মাঝেই আমরা ভাইবোনরা বড় হয়েছি।পারিবারিক রীতি মোতাবেক পড়াশুনাটা ছিল স্বাভাবিক। আমার পিতামহ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলমান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। সিলেট শহরে আমাদের সে রকমের একটা পরিচিতি ও সম্মান ও আভিজাত্য ছিল এবং আছে । আমার বাবা পেশায় একজন এডভোকেট হলেও ব্যস্ত থাকতেন রাজনীতি চর্চায়। তিনি এম.এ, এল.এল. বি. করেছিলেন কলকাতা হতে। সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। আমার দাদা ছিলেন খান বাহাদুর। তিনি সে সময়ের গ্রাজুয়েট। ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় আমার আব্বা ছিলেন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার তত্ত্বাবধানে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং করিমগঞ্জের কিছু অংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। আমার মা-ও একজন সমাজসেবী ছিলেন। আমার ফুফু সিলেটে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। আমার মার মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের পর আমার বাবার উৎসাহে মা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মৃত্যু কালেও তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। দুজনেই শিক্ষার প্রসারে সমাজ

সেবায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন। আমরা সব ভাইবোন-ই এইচ. এস.সি. পাসের পর ঢাকায় এসে পড়াশুনা করেছি। বর্তমানে আমরা ১২ ভাইবোন। আমার এক বোন ১৯৭১ সালে মারা গেছেন আর বড় ভাই ১০ বছর আগে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, ভাইবোনদের মধ্যে তৃতীয়। আর আমি চতুর্থ। বাড়ীর রীতি অনুযায়ী বাড়ীতেই আমাদের পারিবারিক শিক্ষক ছিলেন যার কাছে আমরা সব ভাইবোনই কমবেশী পড়েছি। তিনি ছাড়া আমার শিক্ষক ছিলেন আমার বড় ভাই । আমাদের পরিবারে ধর্মীয় গোড়ামী ছিলনা কিন্তু ছোটবেলায় আমাদেরকে নামাজ পড়া, কোরান শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাড়ীতেই পড়াশুনা করেছিলাম, তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম বখতিয়ার বিবি বিদ্যালয়ে । এই বিদ্যালয়টি আমার দাদীর নামে প্রতিষ্ঠিত, প্রাইমারীটা সে স্কুলেই ।

বাড়ীর পাশে আমাদের নিজেদের পকুর ছিল। বাবা রোজ সেই বড় পুকুরের এ মাথা ও মাথা সাঁতার কাটতেন। আমাদের সাতাঁর শেখা ও সেই পুকুরেই। ছোটবেলায় একবার আমি আর মুহিত ভাই একসাথে পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমে প্রায় ডুবে যাচ্ছিলাম। আমি বারবার মুহিত ভাইকেই টেনে ধরছিলাম যাতে ডুবে না যাই আর ছোটভাই তো নিজে সাতাঁর জানেনা , পানি খাচ্ছিলাম দুভাইবোন আর তলিয়ে যাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। ভাগ্যিস তখন পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ছেলে যাচ্ছিলো সে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে আমাদেরকে উঠিয়ে এনেছিল। এমন অনেক মধুর স্মৃতি আছে আমাদের ছেলেবেলার যা আজও অমলিন। পারিবারিকভাবে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় ছিল। সাইকেল চালাতাম শহরময়। এখন ভাবতেও পারি না। যেমন- ১৯৮৫/৮৬ সালের দিকে আমার মেয়ে তখন হলিক্রসে পড়েছে। আমার মায়ের কাছে শুনেছে আমি সাইকেল চালাতাম। সে আমাকে এসে বলল- তুমি ছোটবেলায় সাইকেল চালিয়েছো আর এখন আমাকে বারন করছো কেন?- উত্তরে বলেছিলাম সময়টা একরকম না। জোর করে ক'দিন চালালো -তারপর একদিন নিজেই চালিয়ে এসে সাইকেল ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল -আর চালাবে না। কেউ কিছু বলেছে হয়তো। আসলে আমাদের সময়টা ছিল ভিন্ন। আর এখকার সময়টা ভিন্ন। তখন মানুষের জন্য মানুষের সহমর্মিতা আর আন্তরিকতা ছিল অনেক। তাছাড়া পারিবারিক শিক্ষাটাও গুরুত্বপূর্ন। বলতে পারেন তৎকালে আধুনিক প্রগতীশীল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত আর দশটা মুসলিম পরিবারের পারিবারিক আদব কায়দায় কেটেছে আমার শৈশব ।

আমার স্বাস্থ্যঃ বখতিয়ার বিবি বিদ্যালয়ে প্রাইমারী শেষে পরবর্তী পড়াশুনা কোথায় করা হয়েছে?

ডা. শাহলা খাতুনঃ সিলেট অগ্রগামী পাইলট স্কুল (তৎকালীন গর্ভ: গালর্স স্কুল) হতে ১৯৫৪ সালে এস.এস. সি. (ম্যাট্রিকুলেশন তৎকালে) পাশ করি এবং ১৯৫৬ সালে সিলেট এম সি কলেজ হতে এইচ.এস.সি. পাশ করি । সে সময় কলেজে পড়ুয়া বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া মেয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল ।

কলেজে আমরা কেবল ২ জন মেয়ে ছিলাম । আমরা কখনও একা ক্লাসে প্রবেশ করতাম না, শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাসে ঢুকার সময় তাদের সাথেই যেতাম এটাই কলেজের নিয়ম ছিল । তবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি পড়াশুনার ব্যাপারে। এর পর তো ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়া। তখন সারাদেশে একটা মাত্র মেডিকেল কলেজ ছিল যেখানে সারাদেশের ছেলে মেয়েরা পড়তে চাইতো ।

আমার স্বাস্থ্যঃ তাহলে তো আপনাদের ভর্তি হওয়াটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল?

ডা. শাহলা খাতুনঃ অনেকটা, তবে তখন তো ভর্তি পরীক্ষা এখানকার মত ছিল না , তখন প্রথমত ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবার আবেদন করতো । অর্থাৎ এইচ এস সি পরীক্ষায় যারা ভালো ফলাফল করতো তারাই কেবল ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারতো,তার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হতো । এর পর ভর্তি হওয়া । মনে আছে আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছিলেন যে ক'জন চিকিৎসক তাদেরকেই পরবর্তীতে আমরা আমাদের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি। এছাড়াও সাক্ষাৎকার বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন বেশ ক'জন সংসদ সদস্য।

আমার স্বাস্থ্যঃ আপনাদের সময় সারাদেশ হতে কতজন মেয়ে ডাক্তারী পড়ায় ভর্তি হয়েছিল ?

ডা. শাহলা খাতুনঃ সে সময় বেশীরভাগ মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত , তাই উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। আমরা যেবার ভর্তি হলাম সেবার মোট ১১৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল যার মধ্যে মাত্র ১৮ জন মেয়ে । তারমধ্যে আবার চারজন মেয়ে ছিল আগের বছরের যারা ১ম বর্ষেই রয়ে গিয়েছিল। তারা সহ মাত্র ১২ জন ছাত্রী ছিলাম। একেক জন একেক জেলা হতে, এক জেলা হতে ২ জন ছাত্রী পড়ছে এমন উদাহরন কমই ছিল। আমাদের সময় নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী হতে মেয়েরা এসেছিল, একটি মেয়ে এসেছিল নওগাঁ হতে । তার কথা বেশ মনে আছে কারণ সে ছিল বিবাহিত, ওর বর ওকে ভর্তি করিয়েছিল। ওর বরকে আমাদের দেখা হয়নি কিন্তু ওকে সবাই ভাবী ডাকতাম। ওর নাম হারিয়ে গিয়েছিল ভাবী ডাকের সাথে।

আমার স্বাস্থ্যঃ এতগুলো ছেলের সাথে আপনারা এ ক'জন মেয়ে পড়েছেন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি?

ডা. শাহলা খাতুনঃ মোটেই না, বরং সহপাঠী হিসাবে কেবল সম্মানই নয় সহযোগিতাও পেয়েছি যথেষ্ট। কলেজ জীবনে যে শিক্ষকদের আলাদা যত্ন পেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ও সেটা বজায় ছিল সাথে ছিল সহপাঠীদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা। ছেলেরা কখনও আমাদের বসার বেঞ্চে বসতো না। আমাদের সমস্যায় তাদের সহযোগিতা পেয়েছি বন্ধুর মত। আর আমি বরাবরই ছিলাম সাহসী আর স্পষ্টবাদী তাই ছেলেদের ভয় পেতাম না মোটেই, তোয়াক্কা করতাম না তারা

কি ভাববে বা কি বলবে। তাই সেধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি শিক্ষাজীবনে।

আমার স্বাস্থ্যঃ ডাক্তার হবার স্বপ্ন কি ছোটবেলা হতেই ছিল?

ডা. শাহলা খাতুনঃ খুব ছোটবেলায় আমি যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন বড় হয়ে কি হতে চাই এমন একটি রচনা বাড়ী হতে লিখে আনতে বলেছিল।বড়ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি লিখবো? ভাই বলেছিল, চিকিৎসক হতে চাই লিখে দাও - তাই লিখেছিলাম। তাছাড়া ছোটবেলায় বাড়ীতে আমার আম্মাকে দুজন ডাক্তার আসতেন দেখাশুনা করতে বিশেষ করে সন্তান প্রসবের সময় এবং তার আগে পরে। তাদেরকে দেখেছিলাম । ভালোই লাগতো। আমার ফুফা ছিলেন খুব শিক্ষিত, তিনি প্রায় আমাদের বাড়ী আসতেন। পড়াশুনায় তার অনুপ্রেরণাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তো সেই লিখাটাই মাথায় গেথে গিয়েছিল-তাই ভাবলাম ডাক্তারই হবো। আমার বড় ভাই ও ডাক্তার ছিলেন।

আমার স্বাস্থ্যঃ আপনার সকল ভাইবোনই পড়াশুনায় অনেক ভালো এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আজ উজ্জ্বল নক্ষত্র, কার অবদান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন ?

ডা. শাহলা খাতুনঃ আমার মা। আমার মা সে সময়ে জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে আমাদের বাড়ির বৌ হয়ে আসেন। আমাদের দাদার পরিবার ছিল শিক্ষিত । আম্মা এমন পরিবারে এসে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে স্বশিক্ষায় এবং আমার আব্বার সহযোগিতায়। আব্বা আমার মাকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আম্মা আমাদের গড়ে তুলেছেন মানুষরূপে। আব্বার ব্যস্ততা ছিল রাজনীতি , সমাজসেবা এবং দেশের উন্নয়ন। আম্মাকে একা সবদিকই সামলাতে হয়েছে। সমাজসেবায় ছিলেন আব্বার সহযোগী আর পারিবারিক , সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন আন্তরিকতা আর ধৈর্য্যের সাথে। আর পরম যত্নে লালন করেছেন আমাদের এতগুলো ভাইবোনকে। সবচেয়ে বড় কথা সুযোগ সবার জন্য সমান ছিল। সম্পত্তিতে ও আমার বাবা আমাদের সব ভাইবোনকে সমান অধিকার দিয়ে গেছেন। আমার বড় ভাই সেই ১৯৬৪ সালে আমেরিকা হতে পিএইচডি করেছিলেন। আম্মা না থাকলে আমরা সবাই পড়াশুনা করতে পারতাম না। আমরা অনেকগুলো রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছি। ভারত পাকিস্তান বিভক্তি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ইত্যাদি। একেকবার দাঙ্গা হলে স্কুল কলেজ হতে বেশ কিছু শিক্ষক চলে যেতেন। কারন স্কুল কলেজে বেশীর ভাগ শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। সে সময়ে হিন্দুরাই পড়াশুনায় এগিয়ে ছিল। এ ধরনের শিক্ষক সংকট নিরসনে আমার মা ছিলেন একনিষ্ঠ পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমতী। তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিক্ষিত নারীদের শিক্ষকতায় উৎসাহিত করতেন রাজী করিয়ে নিয়ে আসতেন স্কুলে। ওনার কাজ ছিল মেয়েদের শিক্ষা গ্রহনে উৎসাহিত করা আর শিক্ষিত নারীদের শিক্ষকতায় সম্পৃক্ত করা। ছেলে মেয়ের মাঝের তফাৎ টুকু আমরা পারিবারিক ভাবে পাইনি। মায়ের ত্যাগ আর আগ্রহ আর আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যই ছিল আমাদের পড়াশুনায় সফল হবার পেছনের কারন।

আমার স্বাস্থ্যঃ পেশাগতভাবে চিকিৎসা সেবার শুরুটা কবে হয়েছিল?

ডা. শাহলা খাতুনঃ আমি এমবিবিএস পাশ করি ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে আর ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকুরীতে যোগদান করি একই সালের নভেম্বর মাসে অনারারী রেসিডেন্ট সার্জন হিসাবে । তখন মেডিকেল কলেজগুলোতে ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হতো মাত্র ৩ টি পদে। আবাসিক সার্জন বা রেসিডেন্ট সার্জন , এ্যাসিসটেন্ট রেজিস্ট্রার বা রেজিস্ট্রার পদে। এর মধ্যে

রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ছিল পড়ানো আর সার্জনের কাজ ছিল জরুরী বিভাগ এবং আউটডোর ম্যানেজ করা এবং নতুন রোগীর রেকর্ড রাখা ইত্যাদি । দীর্ঘ চার বৎসর এই পদে কাজ করেছি দক্ষতার সাথে।

আমার স্বাস্থ্যঃ এরপর আপনার পেশাগত জীবনে কি পরিবর্তন আসে?

ডা. শাহলা খাতুনঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকুরী করা অবস্থায় ১৯৬৪ সালে আমার সহপাঠী ড. শেখ হুমায়ুন কবীরের সাথে আমার বিয়ে হয়। তিনি চক্ষু সার্জন ছিলেন। আমরা দুজনেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের চাকুরী দিয়ে আমাদের পেশা জীবন শুরু করি। ১৯৬৫ তে আমরা স্কলারশীপ পেয়ে লন্ডনে চলে যাই। তবে হুমায়ুন আমার একবছর আগেই সেখানে গিয়েছিল। সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কলারশীপের সুযোগ খুব একটা দেয়া হতো না। বেশীর ভাগই চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। সার্জারিতে তখন সর্বোচ্চ ডিগ্রী ছিল ডাবল এফ.আর.সি.এস. যা হুমায়ুন করেছিলো। ১৯৬৮ সালে আমি (এফ আর সিওজি) শেষ করে দুজনে একসাথে দেশে ফিরে আসি । দেশে ফিরে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (তৎকালীন পিজি হাসপাতাল) গাইনি এবং অবস বিভাগে কাজ শুরু করি । আর হুমায়ুন যোগ দেয় চক্ষু বিভাগে। তখন পিজি হাসপাতাল এখনকার মত ছিলনা । ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভেতরে আলাদা একটা দালানেই ছিল পিজি হাসপাতালের কার্যক্রম । এটি আলাদা হয়ে বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয় ১৯৭১ সনে, যেসময় আমি সেখানে আসি , আর সেবছরই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হয়। তার চিকিৎসক সার্জন ছিলাম আমি । সার্জারীটা আমিই করি, এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর ছিলাম। এর মাঝে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের জুলাইতে আমাদের দুজনেরই বদলি হয়, খুলনার সদর হাসপাতালে সেখানে ১ বছর কাজ করতে হয়েছিল আমাদেরকে কনসালটেন্ট হিসাবে। কনসালটেন্ট পেশার নাম করণ এবং কার্যক্রম শুরু হয় তখন হতে। একবছর পর আবার ঢাকায়। এভাবেই চলছিল সংসার ও কর্মজীবন ।

আমার স্বাস্থ্যঃ সংসার ও কর্মজীবন সামঞ্জস্য করতে সমস্যা হতো না ?

ডা. শাহলা খাতুনঃ এক্ষেত্রে একটি বিষয় বলি, আমরা কম বেশী এক সাথে কাজ করতাম, ও আমার ক্লাসমেট ছিল বোঝাপড়াটা ভালো ছিল শুরু থেকে । সন্তান মানুষ করায় তার সহযোগিতা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে বেশী, তাই সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি, আমার প্রথম সন্তান লুবনার জন্ম ১৯৬৭ তে লন্ডনে । তখন সেখানে আমরা একা। আমাদের দুজনের পড়াশুনা , বাচ্চা সব সামলানো সহজ হতো না তার সহযোগিতা ব্যাতিত । ঢাকা

ডা. শাহলা খাতুন- এর ছেলে এবং মেয়ে

ডা. শাহলা খাতুন- এর বাবা-মা

মেডিকেলের আমরাই প্রথম ব্যাচ যারা লন্ডন থেকে এসে ঢাকার বাইরের শহরে কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করেছি। এক বছর পর আমরা ঢাকায় ফিরলেও খুলনার কনসালটেন্সী সেবা কার্যক্রম চলছিল। ঢাকা থেকে গিয়ে করতাম। ১৯৭০ সালে এই ঢাকা হতে খুলনা যাবার পথে কার দুর্ঘটনায় অল্প বয়সে মারা যায় হুমায়ন। আমি খেই হারিয়ে ফেলি জীবনের। তবে জীবন বহমান। হুমায়ুন অত্যন্ত মেধাবী ডাক্তার ছিল , বেচেঁ থাকলে দেশের মানুষের কল্যান হতো।

আমার স্বাস্থ্য: এতবড় শোক কাটিয়ে জীবনের মূল ধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে এগিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ। কেমন করে সামলেছেন সব?

ডা. শাহলা খাতুন: সত্যি কঠিন । জীবনতো থেমে থাকেনা আমার দুটি সন্তান তাদের মানুষ করা । তবে আমি আমার ভাইবোনদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি । আমার ভাইয়েরা অবিভাবকের মতই আমার সন্তানদের আগলেছেন বিশেষ করে মুহিত ভাই। হুমায়ুন ১৯৭০ এ চলে যায়। ১৯৭৫সালে আমার ভাইয়েরা আমাকে আবার বিয়ে দেন। তিনি ও পেশায় একজন ডাক্তার। তিনি পাকিস্তান আর্মির ডাক্তার ছিলেন পরবর্তীতে ঢাকায় চলে আসেন। দুজনে ডাক্তারী পেশায় ছিলাম হয়তো তাই বোঝাপড়ায় সমস্যা হয়নি আর আসলে আমার তখন বড় কাজ ছিল আমার সন্তানদের মানুষ করা। বড় মেয়ে আমেরিকার হাভার্ডে পড়াশুনা করেছে । ভালো ভালো চাকুরী করেছে। এখন করেনা কারণ তার দুই মেয়ের বড় মেয়ে এখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে তাকে নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে ডাক্তারী পড়ায় ভর্তি হয়ে আর পড়েনি। ডাক্তারী পড়া তার পছন্দ না। সে পরে আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে দেশে ফিরে এসেছে। সে দেশেই থাকে তার ৩ ছেলে। ১৯৯৭ সালে আমি আমার দ্বিতীয় স্বামীকে হারাই। রোজকার অভ্যাস মত সকালে হাটতে বেরিয়ে রাস্তায় হার্টঅ্যাটাক করে সেখানেই শেষ। কিছু করার সুযোগ পাইনি। তারপরও চেষ্টা করেছি সন্তানরা যেন মানুষ হয়।

> *"আর ঢালাওভাবে কোন পক্ষকে চিকিৎসা উন্নয়নের আঠাঁ হিসাবে উল্লেখ করা যাবে না, একই ভাবে এর সমাধান বা উন্নয়নে প্রতিটি স্তরেই মনোযোগী হতে হবে। প্রয়োজন, একটি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আর গণ সচেতনতা।"*

আমার স্বাস্থ্যঃ এবারে একটু পেশাগত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই । আপনাদের সময়ে মেয়ে রোগী আপনারা পেতেন তাতে কি ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল বেশী?

ডা. শাহলা খাতুনঃ আসলে তখনকার নারী শিক্ষার হার ছিল নগণ্য সে সাথে নারীর মানুষ হিসাবে মূল্যায়নের অভাব ছিল , তদুপরি শিক্ষা এবং পারিবারিক, সামাজিক পরিস্থিতির কারনে মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনও ছিলনা । আবার সমস্যা নিয়ে কারো সাথে আলোচনাও করতো না , তারা এক ধরণের লজ্জাবোধ এবং পারিবারিক শৃঙ্খলাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল। তাই ১৫ বৎসর বয়সের আগে কোন মেয়ে খুব একটা ডাক্তারের কাছে স্বাভাবিকভাবে আসতো না । মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতার বা চিকিৎসার বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল তাদের প্রসব সময়কাল এবং এর আগে বা পরের সময়ের মধ্যেই ।

অথচ ১৫ বৎসর আগে তার শরীরে কত ধরনের পরিবর্তন ঘটে। কত ধরণের সমস্যা হতে পারে যা তার পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন। এটা একবারেই গুরুত্বহীন ছিল সমাজ ও পরিবারে। তাই অবিবাহিত মহিলা রোগীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। আবার ৪০ উঠা বা ৮৫ উর্ধ্ব রোগীর সংখ্যা ও কম ছিল । কয়েকজন আসতো সেটা ছিল জরায়ুজনিত সমস্যা।

আমার স্বাস্থ্যঃ বর্তমানে অনেক মেয়েরাইতো কাজ করছে তাহলেতো এটা বলা যায় যে- এখনকার নারীরা স্বাস্থ্য সচেতন, আপনার কি মনে হয়?

ডা. শাহলা খাতুনঃ এটা সত্যি যে এখনকার নারীরা অনেক এগিয়েছে, সবাই কিছু না কিছু করছে । নারী শিক্ষার হারও বেড়েছে। বেড়েছে সচেতনতাও এখন সমস্যা হলো সুযোগের। আর্থিকভাবে স্বচ্ছলদের জন্য হয়তো প্রাইভেট হাসপাতালে
চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষের ভরসা সরকারী হাসপাতালগুলো, কিন্তু সেখানে রোগীর সংখ্যার তুলনায় সুযোগ কম । তবে সরকারী হাসপাতালগুলো চেষ্টা করছে । সেবার মান উন্নয়ন এবং সুযোগ বাড়াতে,তাই সচেতন হওয়া সত্ত্বে ও সাধারন মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ কম। সত্যিকথা বলতে কি জাতীয় ভাবে বাজেটে আমাদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন বাজেট তুলনামূলক কম। একইভাবে পারিবারিক বা ব্যক্তিগতভাবে আমরা শপিং এর বাজেট তো

করি কিন্তু নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য মোট বাজেট রাখি না । এই বিষয়ে আমাদের সকলের একটু সচেতন হওয়া উচিত । সরকারী বাজেটের ও সীমাবদ্ধতা আছে এটা ভাবতে হবে। বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। এটা সচেতনতারই ফলাফল ।

আমার স্বাস্থ্যঃ কিন্তু এখনও ১৫-১৯ এর বয়সী মেয়েরা মা হচ্ছে যা তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিঁপূর্ন । আপনি কি মনে করেন?

ডা. শাহলা খাতুনঃ ১৫-১৯ বয়সটা এমন নয় যে এই বয়সে মা হতে পারবে না । বিষয়টা হলো এই বয়সে মা হওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশী তাই যত্নটাও বেশী নিতে হবে এবং সচেতন থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি বলব এখন সচেতনতা বেড়েছে। ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েরা মা হচ্ছে সত্যি যত্ন আত্তি বেড়েছে বলে তারা আগে থেকেই ডেলিভারীর ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে পারছে এবং সে অনুযায়ী স্বাস্থ্য নিয়ম মেনে চলছে ফলে এই বয়সী মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে । এছাড়াও এখন নরমাল ডেলিভারীর চেয়ে সিজারই বেশী হচ্ছে ঝুঁকি কমে যাচ্ছে, নরমাল ডেলিভারী কমে যাওয়াতে। যদিও সিজার সবসময়ই যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তা নয়। সি-সেকশন একটি বিশেষ ব্যবস্থা এবং তার অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যেহেতু এটি একটি গুরুতর অপারেশন, তাই অপারেশন চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে জটিলতা হতে পারে। পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অজ্ঞান করে এই অপারেশন করতে হয় বলে এনেসথেসিয়া সম্পর্কিত জটিলতাগুলো হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সি-সেকশনের পরে প্রসূতি মানসিক চাপ, অতৃপ্তি, বাচ্চার সঙ্গে দুর্বল সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্যায় ভোগেন।

আমার স্বাস্থ্যঃ দেশে বর্তমানে সিজারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। চিকিৎসার প্রয়োজনে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

ডা. শাহলা খাতুনঃ চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে শুধু ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে নরমাল ডেলিভারি না হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। কেবল সে ক্ষেত্রেই মা ও সন্তানের জীবন রক্ষার স্বার্থে সিজারিয়ান সেকশন বা সি-সেকশন দরকার হতে পারে। এর বেশি হলেই তা অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান। বাংলাদেশে ২০০৪ সালে সি-সেকশনের হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ শতাংশে। এর মধ্যে কমপক্ষে ৮ শতাংশ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় সি-সেকশন। দেশে ১০ বছরের ব্যবধানে সিজারিয়ান ডেলিভারি বেড়েছে ছয় গুণ, যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে প্রায় ৮০ শতাংশ ডেলিভারিই হচ্ছে সি-সেকশনের মাধ্যমে, যেখানে সরকারি হাসপাতালে এই হার ৩৮ শতাংশ। আবার দেখা যাচ্ছে, প্রসূতিরা যত ধনী ও শিক্ষিত, তাদের মধ্যে সি-সেকশনের হারও তত বেশি। অর্থাৎ যারা সচেতন থাকার কথা তারাই এ ক্ষেত্রে বেশি অসচেতন।

কেবল প্রাইভেটেই নয়, প্রাইভেটের প্রভাবে দ্রুত দেশের সরকারি হাসপাতালেও সি-সেকশনের হার উর্ধ্বমুখী। তার প্রমাণ হচ্ছে সরকারি হাসপাতালেই ২০০৪ সালে এই হার ছিল বছরে মোট ডেলিভারির ৫ শতাংশ। ২০০৭ সালে ৯, ২০১১ সালে ১৭, ২০১৪ সালে ২৩ এবং ২০১৬ সালে বেড়ে হয় ৩৮ শতাংশ।

আমার স্বাস্থ্যঃ এক্ষেত্রে একজন ডাক্তার হিসাবে আপনি কি মনে করেন কেন সিজারে ডেলিভারী বাড়ছে বিষয়টাতে কি ব্যবসায়ী মুনাফাই মুখ্য?

ডা. শাহলা খাতুন: এটা ঢালাও ভাবে বলা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ডাক্তার এবং রোগীর, উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে ।গর্ভবতী মা এবং তার আত্নীয় স্বজনের ক্ষেত্রে এমন ধৈর্য্যের পরিমাপটা কমে গেছে। অভিভাবকরাও আর স্বাভাবিক প্রসবের ঝুঁকি নিতে চায়না , গর্ভবতী নিজেও প্রসব ব্যাথার কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য্য ধরতে চায়না ফলে সিজারে তাদের আগ্রহ । অপরদিকে রোগী বেশী থাকায় ডাক্তারের পক্ষে একজন রোগীর ডেলিভারীর জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে স্বাভাবিক প্রসবের জন্য সময় দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে সিজারে তাদেরও আগ্রহ, হ্যাঁ বাণিজ্যিক বিষয়টিতো আছেই। এছাড়াও হাসপাতাল সেবা এবং বিবাহিত সিস্টেম-এ ও কিছু জটিলতা আছে। আমাদের সময় হসপিটলে রেজিস্ট্রার রেসিডেন্ট সার্জন এবং কনসালটেন্ট ছিল। এখন ছাত্রছাত্রী আর কনসালটেন্ট এর মাঝামাঝি কিছু নাই । আগের মতো প্রশিক্ষণের সুযোগ নাই। ছাত্রছাত্রী বেশী হওয়াতে হাতে কলমে শেখার সুযোগটা কমে গেছে । আবার শিক্ষকরাও আগের মত সময় দিতে পারে না। আবার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার বিষয়টি আছে । আমাদের দেশেও যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ঘটেছে। দেশে অনেক প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু গুনগত শিক্ষার্থী নাই , শিক্ষক ও নাই সেই অর্থে । নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে চিকিৎসাসেবাও এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে এটা সত্যি একশ্রেণীর চিকিৎসাকেন্দ্র প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সিজারিয়ান সেকশন করে ফেলছে। চিকিৎসকদের একটি অংশ এই অন্যায়ে জড়িত হচ্ছে, যারা প্রসূতিদের প্রভাবিত করছে।

আমার স্বাস্থ্য: চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ডা. শাহলা খাতুন: আসলে বর্তমান সময়ে চিকিৎসা কেবল সেবা নয় এটা একটা শিল্পখাত। সব কিছুই এখন ব্যবসায়িক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে চিকিৎসাসেবাও এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি অংশ এই অন্যায়ে জড়িত হচ্ছে, যারা সেবার তুলনায় নিজের প্রচার ও প্রসারেই বেশী মনোযোগী। তাই যোগ্য চিকিৎসকের সংখ্যা যেমন বেড়েছে সেই তাদের যোগ্যতাকে যথাযথ মূল্যায়নে আর্থিক বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ন । আর ঢালাওভাবে কোন পক্ষকে চিকিৎসা উন্নয়নের বাধা হিসাবে উল্লেখ করা যাবে না একই ভাবে এর সমাধান বা উন্নয়ন ও এককভাবে করলে হবে না । প্রতিটি স্তরেই মনোযোগী হতে হবে। এগুলো বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তদুপরি আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজন একটি হলিস্টিক এ্যাপ্রোচ আর গণসচেতনতা ।

আমার স্বাস্থ্য: আজকাল সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে বাবা মায়েরা খুবই উদগ্রীব, বিশেষ করে প্রযুক্তির

আসক্তি এবং অস্থিরতা বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ডা. শাহলা খাতুন: বাড়ীতে মা বাবার মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক সন্তানকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। বাবা মার যত্নটা খুব জরুরী। পিতামাতাকে সন্তানের বুঝতে হবে। আবার পিতামাতাকে বুঝতে হবে। আজকাল বাচ্চারা খুব অশান্ত। পিতামাতাকেই নকল করে সন্তান। ভালো দেখলে ভালো শিখবে। শাসন করতে হবে আবার ভালোবাসতে হবে। আজকাল আমরা বাচ্চাদের মনের কাছে যেতে পারছি না। একটা বন্ধুর সম্পর্ক আগে বড় ছোটদের মধ্যে একটা সম্প্রীতি ছিল। বড়দের সাথে ছোটদের বেড়ে ওঠা। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য বুঝে করবে। এখন হয়তো মায়েরা সময় দিতে পারছেনা। কারণ মেয়েরা এখন বাইরে সময় দিচ্ছে। এটার কারণেই সে সন্তানের জন্য ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছে । কিন্তু এ বিষয়টা কেমন যেন নেতিবাচক হয়ে গেছে। সন্তানরা মা বাবাকে সময় দিচ্ছে না ।

আমার স্বাস্থ্য: পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে?

ডা. শাহলা খাতুন: পরিবারের সকল সদস্যদেরই বাড়ীর শিশুটির প্রতি যত্নশীল হতে হবে । বাবাদের উচিত হবে সন্তানদের সাথে সময় কাটানো যেহেতু মায়েদের অফিসের পর আবার বাসা সামলানোর বিষয়টি রয়েছে। স্কুলে শিশু মনোবিজ্ঞানী থাকলে ভালো হতো। আজকালকার বাচ্চারা বোকা নয় বুদ্ধিমান। আমরা বড়রা যা বলতো তাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা তা নয় তাদের কিছু বলেই বিশ্বাস করবে তা নয় । তারা ইন্টারনেটে সেটা দেখবে । তাই আমি মনে করি ছোট বেলা হতেই বাচ্চাদের স্কুলে মানসিক বিকাশের জন্য আলাদা ক্লাস নেওয়া উচিত । তাছাড়া তারা সারাক্ষন চারপাশে খুনাখুনি, নির্যাতন দেখছে এটাও তাদের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে । এটা আমাদের দোষ। আমি চিন্তা করি এ অবস্থা হতে উত্তোরনের উপায় কী হতে পারে। তেমনি আমাদের আরো মনোবিজ্ঞানী দরকার যারা এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে গবেষনা এবং বিশ্লেষণ করে একটা সমাধান বের করবে।

আমার স্বাস্থ্য:আপনার সন্তানের সফলতা কি আপনার আশানুরূপ হয়েছে ?

ডা. শাহলা খাতুন: আমরা কোনদিন কোন কিছু পাবার আশায় কিছু করিনি। আমরা আসলে কাজ করতে হবে ভেবে কাজ করেছি। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে অনেক মানুষের সেবা করেছি। কোন প্রত্যাশা ছিল না। মানুষকে ভালো রাখতে চেয়েছি। নিজে ভালো থাকার চেষ্টা করেছি। '৮০র দশকে প্রতিদিন সকলের বাড়ীতে গিয়ে বিনা পয়সায় কাজ করেছি। আমরা অনেকেই এটা করেছি। বিনিময়ে কিছু চাইনি। চেয়েছি তাদের উপকারটা যেন হয়। আবার বাবা মা আমাদের পড়াশুনা করিয়েছে। নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছেন , সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। কারণ তারা মনে করতেন ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়েছে। তাদের ভালোমন্দ বোঝার যোগ্যতা হয়েছে। একইভাবে আমার সন্তানরাও আত্নবিশ্বাসী হয়ে বড় হয়েছে। আমার মেয়ে যখন আমেরিকায় পড়তে যায় সে কেবল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই নির্বাচন করেছে পড়াশুনা করার জন্য সেটা ছিল- হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। । তখন অনেকে বিশেষ করে মুহিত ভাই বলল সে কেবল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে ভুল করলো কিনা। কিন্তু সে হাভার্ডেই ভর্তির সুযোগ পেল। আমার ছেলেও তাই। সে ছোটবেলায় ক্যাডেটে ভর্তি হতে চাইলো এবং সে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছে। যদিও সে পরে সেখান থেকে চলে এসেছে। সেন্ট জোসেফ হতে এইচ.এস.সি. করেছে। পরে বোস্টন হতে অর্থনীতিতে পড়াশুনা করে দেশে এসেছে। তো যেটা বলছিলাম আমার কাজ ছিল তাদের সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষাটা শিখানো যা পেয়েছিলাম আমার পরিবার হতে, সেটা করার চেষ্টা করেছি । তারা আজ আত্নবিশ্বাসী , শিক্ষিত এবং যোগ্য। বাকী তাদের কর্ম এবং পরিশ্রম।

আমার স্বাস্থ্য: বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন একটি জাতীয় বিষয় ,নারীর অধিকার উন্নয়নে কোন ৩টি উপদেশ দিবেন ?

ডা. শাহলা খাতুন: প্রথমত; শুরু করতে হবে পরিবার হতে, মনে করতে হবে মেয়েরা আর গলগ্রহ নয় ,তাদেরকে পরিবারে সমআদর ও যত্নে মানুষ করতে হবে। সমান সুযোগ দিতে হবে পড়াশুনা এবং অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ।

দ্বিতীয়ত; সুযোগ পেলে মেয়েরাও ভালো করতে পারে,সেই সুযোগ হতে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না । মেয়েরা স্বামী এবং সমাজকে ভয় পায় ,তাই নারীকে তার প্রাপ্য সম্মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়; নিরাপত্তা । ঘরে বাইরে সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে, পরিবারে নারীরা আজ নিরাপদ নয় এই নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টিকে সর্বস্তরে গুরুত্ব দিতে পারলে নারীরা এগিয়ে যাবে বহুদূর।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকেও ধন্যবাদ ।

নাজনীন নাহার
লেখক ও সাংবাদিক

চোখ ভালো রাখতে কী করবেন?

চোখ ভালো রাখতে বাইরে বের হওয়ার সময় রোদচশমা ব্যবহার করুন।

অবস্থানগত কারণেই গোলাকার চোখ সব সময় সুরক্ষিত। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকুও চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ছাড়া আইলেশ ও আইব্রু চোখকে ধুলো-ময়লা থেকে রক্ষা করে। চোখের পানি সাধারণত ধুলাবালু ও রোগ-জীবাণু ধুয়ে ও ধ্বংস করে চোখকে সুস্থ রাখে।
চোখ ভালো রাখতে আরও যা করতে পারেন-

আলোর সঠিক ব্যবহার

চোখ যেকোনো আলোই কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রহণ করে নিতে পারে। কিন্তু চোখ ভালো রাখার জন্য কম আলো বা তীব্র আলোতে লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্ম করা উচিত নয়। দিনের বেলা সূর্যের আলো সরাসরি চোখে না পড়াই ভালো। রাতে টিউব লাইটের আলো চোখের জন্য আরামদায়ক। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখাপড়ার সময় ল্যাম্পটি দেয়ালের দিকে রেখে প্রতিফলিত আলোতে পড়া ভালো।

টিভি দেখা

টিভি দেখার সময় টিভির পেছনের দিকের দেয়ালে একটি টিউব লাইট বা শেড-যুক্ত ৪০ বা ৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে টিভি দেখা উচিত। সম্পূর্ণ অন্ধকার কক্ষে টিভি দেখা ঠিক নয়। দিনের বেলা যে দরজা বা জানালার আলো টিভি স্ক্রিনে প্রতিফলিত হয়, সেগুলো বন্ধ রাখাই ভালো। সাধারণত ১০ ফুট দূর থেকে টিভি দেখা উচিত। তবে ছয় ফুটের কম দূরত্ব থেকে টিভি দেখা উচিত নয়। বড়-ছোট বিভিন্ন সাইজের টিভি দেখার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ঝিরঝির করা, কাঁপা কাঁপা ছবি ও ভৌতিক ছায়াযুক্ত ছবি না দেখাই ভালো। রঙিন টিভিতে রং, উজ্জ্বলতা ও কন্ট্রাস্ট ঠিক রেখে টিভি দেখতে হবে। একটানা অনেকক্ষণ টিভি দেখা উচিত নয়, মাঝেমধ্যে দর্শন বিরতি দিয়ে টিভি দেখা চোখের জন্য ভালো।

প্রসাধনীর ব্যবহার

প্রসাধনী চোখের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত প্রসাধনী চোখে ব্যবহার করলে অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস, ব্লেফারাইটিস, স্টাই ইত্যাদি রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

মাথায় খুশকি থাকলে সপ্তাহে দু'বার খুশকিনাশক শ্যাম্পু ব্যবহার করে মাথা খুশকিমুক্ত রাখতে হবে। নইলে মাথার খুশকি থেকে চোখ আক্রান্ত হয়ে চোখে ব্লেফারাইটিস দেখা দিতে পারে।

ধুলো-ময়লা ও দূষিত পরিবেশ

প্রতিদিন কাজের শেষে চোখ ঠান্ডা ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি চোখের শত্রু। তাই সূর্যালোক থেকে দূরে থাকা উত্তম। রোদে গেলে সানগ্লাস পরা উচিত। যাঁদের এমনিতেই চশমা পরতে হয়, তাঁদের ফটোক্রোমাটিক লেন্স ব্যবহার করা আরামদায়ক হবে। কনজাংটিভাইটিস, কর্নিয়াল আলসার, আইরাইটিসের

রোগীদের জন্য এবং ছানি অপারেশনের পর কালো চশমা ব্যবহার করা জরুরি। চোখ ভালো রাখতে প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঠান্ডা ও পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ভালোভাবে ধুয়ে ঘুমানো উত্তম।

বিভিন্ন রোগের সময় চোখের যত্ন

বাচ্চাদের হাম, জলবসন্ত, হুপিংকাশি, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক। এসব রোগের ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা না দিলে চোখের স্থায়ী ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে চোখে ডায়াবেটিক রেটিনোপেথি হতে পারে। এসব রোগে নিয়মিত ও সঠিকভাবে ডায়াবেটিস বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে চোখ ভালো রাখা সম্ভব।

চশমার ব্যবহার

যাদের চোখে চশমা প্রয়োজন, তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে চশমা পরা উচিত।
স্বাভাবিকভাবেই ৪০ বছরের কাছাকাছি বয়স থেকেই পড়াশোনা করতে ও কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। এ সময়ে অনেকেই নিজের মনমতো রেডিমেড দৃষ্টিশক্তির চশমা ব্যবহার করেন, যা চোখের জন্য ক্ষতিকর। অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় চশমা পরবেন। আবার অনেকে মনে করেন, এ সময় চশমা ব্যবহার করলে সারা জীবন চশমা ব্যবহার করতে হবে। তাই চশমা ব্যবহার করেন না। এ সময় চশমা ব্যবহার করলেই চোখ ভালো নতুবা পড়াশোনা বা কাছের জিনিস দেখতে চোখে চাপ পড়ে। এই চাপ চোখের ক্ষতি করতে থাকে। চশমা সব সময় পরিষ্কার রাখা উচিত। অস্বচ্ছ ও ফাঁটা লেন্স ব্যবহার করা উচিত নয়।

হঠাৎ চোখে কিছু পড়লে

মূলত ধুলোকণা, কীটপতঙ্গ, ছোট ইটপাথর বা কাঠের টুকরা থেকে শুরু করে ছোট খেলার বল নানা কিছু আছে হঠাৎ চোখে পড়তে পারে। এসবের কারণে চোখে প্রথমে খচখচে ভাব হয়, চোখ দিয়ে অবিরত পানি পড়ে, তাকালে চোখ জ্বালা করে এবং চোখ বন্ধ রাখলে আরাম হয়, চোখ লাল হয়ে যায়। দ্রুত বের করে নেওয়া না হলে সেই ময়লা কর্নিয়ায় ঘষা লেগে চোখের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে, ক্ষতির এক পর্যায়ে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া ও অস্বাভাবিক নয়। এমন অনুভূতি হলে সবাই, বিশেষ করে বাচ্চারা খুব ঘন ঘন চোখ কচলাতে বা চুলকাতে থাকে, এমন কাজটি একেবারেই করা যাবে না। দেখা যায় এমন সহজ কিছু পড়ে থাকলে কটন বাডস বা তুলো একটু পেঁচিয়ে অন্যের সাহায্য নিয়ে আলতো করে বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে।

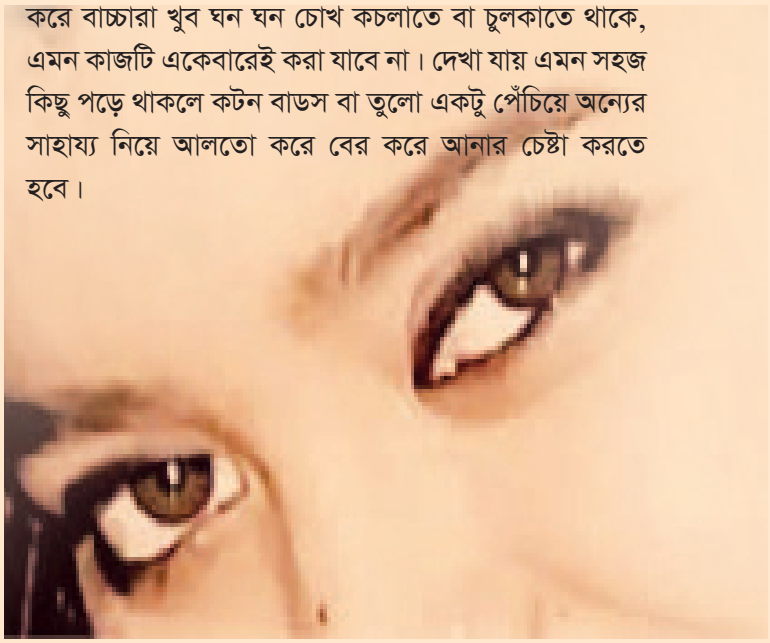

শীতে মুখ চালাতে থাকুন এই ড্রাই ফ্রুটগুলি দিয়ে

শীতে আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের শরীরকে গরম রাখতে অনেক ভিটামিন খেতেন। এই ভিটামিনের প্রধান উৎস ছিল বিভিন্ন ফল। শীতকালে বেশি ফল পাওয়া যায় না বলেই ড্রাই ফ্রুটস খেয়ে শরীরকে চাঙ্গা রাখতেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। শীতের রোগ দূরে রাখতে সাহায্য করত এই শুকনো ফলগুলো। এখনও শীতকালে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক এই উপায়। অনেক পরিবারে দাদী- নানীরা এখনও শীতের আগে এই ড্রাই ফ্রুট তৈরী করে বোয়ামে জমিয়ে রাখেন।

যে কোন ফল স্বাস্থ্যকর ডায়েটের জন্য আদর্শ। আর তা যদি হয় ড্রাই ফ্রুট তাহলে তো কথাই নেই। শীতে স্বাস্থ্যকর ডায়েট চালিয়ে যেতে খেতে পারেন এই ড্রাই ফ্রুটগুলি।

শুকনো খেজুর

ড্রাই ফ্রুট বললেই যে জিনিসটির নাম সবার আগে মনে পড়ে তা হল খেজুর। তবে শুধু শীতের সময় নয় সারা বছরই এই ড্রাই ফ্রুট খাওয়া যেতে পারে। তবে শীতের সময় ঠান্ডাকে দূরে রাখতে সাহায্য করে খেজুর। এছাড়াও মাথা যন্ত্রণা ও ব্যাথায় দারুন কাজ দেয় জনপ্রিয় এই ড্রাই ফ্রুট। ইমিউন সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে। শীতে রোগ দূরে রাখে খেজুর।

শুকনো পেঁপে

শরীরকে শক্তিশালী করে সব ধরণের রোগ দূরে রাখতে সাহায্য করে পেঁপে। পেঁপে খেলে শরীরে প্রোটিন মেটাবলিজম বাড়ে। যা সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে সাহায্য করে।

শুকনো এপ্রিকট

পটাশিয়ামে ভর্তি এপ্রিকট। খুব কম ফলের মধ্যেই এতো পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এপ্রিকট আপনার হৃদপিন্ড শক্তিশালী করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ক্যান্সার দূরে রাখতে এপ্রিকটের জুরি মেলা ভার।

শুকনো নাশপাতি

ক্ষুদান্ত্রের দেখভাল করে নাশপাতি। শরীর থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ বের করে অন্ত্রের রোগ দূরে রাখে এই ফল। এছাড়াও শরীর থেকে বিভিন্ন ভারি ধাতু বের করে দেয়ও নাশপাতি।

শুকনো কিশমিশ

হতাশা দূরে রাখে কিশমিশ। এছাড়াও থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা থাকলে সারা বছর রোজই কিশমিশ খেতে পারেন।

শুকনো চেরি

ত্বকে ঝলমলে করে তোলে ড্রাই চেরি। পুরনো ত্বক খশিয়ে ত্বকে নতুন কোষ তৈরীতে সাহায্য করে চেরি।

শুকনো পেয়ারা

ভিটামিন এ ও সি তে ভর্তি থাকে পেয়ারা। এছারাও পেয়ারাতে থাকে প্রচুর পটাশিয়াম, ও ম্যাগনেশিয়াম। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে ওজন কমাতে সাহায্য করে এই ফল।

শুকনো ডুমুর

থাইরয়েডের রোগ দূরে রাখে ডুমুর। এছাড়াও শরীরকে পরজীবী আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে এই ফল। ক্যান্সার কোষ তৈরী বন্ধ করে ডুমুর। ডুমুরের অতিরিক্ত ভিটামিন ত্বককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

বাদাম

শীতে বিভিন্ন ধরণের বাদাম স্টক করতে পারেন। আখরোট, ওয়ালনাট, আমন্ড, হেজেলনাট সহ বিভিন্ন ধরণের বাদাম জাতীয় খাবার ঘরে রাখতে পারেন। যে কোন ধরনের বাদাম ত্বকের জন্য ভালো। এছাড়াও শীতে শরীর গরম রাখবে বাদাম। রক্তচাপ ঠিক রেখে শীতের দিনে শরীর গরম রাখতে বাদামের তুলনা হয় না। শীতে নিয়মিত বাদাম খেলে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

জাদু আছে জুসে, ওজন কমাবে বিট!

এই ঠাণ্ডায় নানা রঙের কত সবজি বাজারে। কিন্তু সুগার হতে পারে এই ভয়ে মাটির নীচের সবজি বাদ দিয়েছেন তালিকা থেকে। অযথা ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে খান।

একটু ওজন ঝরানোর জন্য কত কসরতই না করতে হয়। সকালে উঠে হাঁটা, তারপর সুযোগ হলে জিম, জীবন থেকে ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট একেবারে বাদ দেওয়া আরও কত কিছু। অনেকেই আবার এই রুটিন একনাগাড়ে মেনে চললেই হাঁপিয়ে যান। তখন মনে হয়, ফাইবার, মিনারেলস আর ভিটামিন আর কতদিন!

বিট-গাজরের জুস বা বিটের সঙ্গে আপেল বেদানার জুস বানিয়ে খান। শরীরের ডিটক্সিফিকেশন হবে। তাতে কমবে ওজন, ত্বকে আসবে ঔজ্বল্য। এছাড়াও এখন বাজারে বিটের জ্যাম পাওয়া যায়। তারমধ্যেও কিন্তু ভিটামিন থাকে।
চটজলদি ওজন কমাতে কেন বিটের জুস খাবেন তা একবার দেখে নিন:

বিটের জুসে প্রচুর পরিমাণ মিনারেল আর ভিটামিন থাকে। এছাড়াও ফাইবার থাকে। যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও ১০০ এম এল বিটের জুসে ক্যালোরির পরিমাণ ৩৫।

বিটের সঙ্গে গাজর, আপেল, টমেটো এবং বেদানার জুস মিশিয়ে নিন। তাহলে তার পুষ্টিগুণ হবে অনেক বেশি এবং ওজনও ঝরবে তাড়াতাড়ি।

জিভের রং দেখে শরীর বুঝুন

অনেকেই বলেন, হাতের নখের পরীক্ষা করেই বলে দেওয়া সম্ভব শরীরে কোনও রোগবালাই আছে কি না। অনেকের মতে, চোখের সাদা অংশ কতটা সাদা, কতটা লালচে, সেটা থেকেও স্বাস্থ্যের হাল বলা সম্ভব। এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় দেখে বলা সম্ভব স্বাস্থ্যের হালের কথা। সেটি হল জিভের রং। চিকিৎসকরা তাই পরামর্শ দিচ্ছেন, জিভের রঙের তেমন পরিবর্তন হলে, অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। জিভের রঙের কোন কোন পরিবর্তন দেখে বুঝবেন, শরীরের হাল কেমন?

১। সাদা চিজের যেমন রং, জিভের রং যদি তেমন হয়ে যায়, বুঝবেন আপনার ইমিউনিটি সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। অনেক সময় টানা অ্যান্টিবায়োটিক খেলে এই সমস্যা হয়। ব্যাকটেরিয়া ওষুধের কারণে মারা গেলে, জিভে অতিরিক্ত ইস্টের ইনফেকশন হতে থাকে। চিকিৎসার ভাষায় একে ওরাল ব্রাশ বলে। লিউকোপ্লাকিয়া বলে একটি সমস্যার কারণেও জিভে সাদা-সাদা দাগ হয়। এটি বিপজ্জনক এবং ক্যান্সারের পূর্বাভাস হতে পারে। ওরাল লাইকেন প্ল্যানাস হলেও সাদা দাগ হয়। তবে এটি বিপজ্জনক নয়। খুবই বিরল অসুখ। এবং নিজেই সেরে যায়।

২। **লাল জিভ:** জিভের রং নানা কারণে লাল হয়ে যেতে পারে। তবে প্রধান কারণটা নিঃসন্দেহে ভিটামিনের অভাব। শরীরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স কমে গেলে জিভের রং টকটকে লাল হয়ে যায়, তাছাড়া আয়রনের অভাবেও একই জিনিস হতে পারে।

তবে এক্ষেত্রে জিভের তলটি খুব মসৃন হয়ে থাকে। অন্য সমস্যার ক্ষেত্রে তা হয় না। যেমন অনেক সময়ই দেখা যায়, লাল রঙের উঁচু-নিচু আকৃতি তৈরি হয়েছে জিভে। এটিকে 'জিওগ্রাফিক টাং' বলে। এটি একেবারেই ক্ষতিকারক নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি সেরে যায়।

৩। **কালো বা বাদামি জিভ** এর অর্থ আপনার মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের হাল নড়বড়ে। এটা ব্যাকটেরিয়া বা ফাংগাসের কারণে হওয়া ইনফেকশন থেকে হতে পারে। তবে প্রথমেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। এক্ষেত্রে জিভের উপরিভাগ ফুলে কালো উঁচু-নিচু আকৃতি নেয় এবং সেখানে

চুলের মতো কালো সেল জন্মায়। এই কারণেই একে ‘ব্ল্যাক হেয়ারি টাং’-ও বলা হয়। তবে প্যাপিলার অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে এই সমস্যা হতে পারে। যারা ধূমপান করেন, তাঁদের এই সমস্যাটা হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা বড় আকার নিতে পারে।

৪। **ফাটা জিভ:** এটি খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটি হয়। ফলে এটিকে বয়স বাড়ার লক্ষণ হিসেবেও দেখতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে, এটি কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু এটি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষত যাঁরা মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেন না, যারা মুখের ভিতরের যত্ন কম নেন, তাদের এই ফাটা জিভ থেকে ইনফেকশন হতে পারে। কারণ এই ফাটা জিভের ফাটলগুলিতে সহজেই সংক্রমণ হতে পারে। তাই এই সমস্যা হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভালো।

৫। **হলুদ জিভ:** এটির কারণ সকলেই জানেন। মূলত জন্ডিস বা লিভারের অন্য কোনও সমস্যা হলেই হলুদ জিভ হয়ে যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পেটের প্রদাহও হয়। তাই হলুদ জিভ দেখলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার

ইতিহাসঃ

১৯৭০ সালের শেষ দিকে বগোটা কলম্বিয়াতে অপরিণত শিশুদের মৃত্যুহার হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যায়। সেইসময় প্রায় ৭০% অপরিণত শিশু মৃত্যুবরণ করে যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ধারণার উৎপত্তি হয়। ১৯৭৬ সালে Peter de Chatea বগোটা কলম্বিয়াতে 'Early contact with Mother & baby' সম্পর্কে বলেন। ১৯৭৮ সালে কলম্বিয়াতে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার পদ্ধতি শুরু করা হয় এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোতেও এ সম্পর্কে মা দের উৎসাহিত করা হয়।

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (Kangaroo mother care) কী?

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার হল সময়ের পূর্বে ও স্বল্প ওজনের শিশুদের যত্নে মায়ের ত্বকের সাথে শিশুর ত্বকের সংস্পর্শ/লাগিয়ে রাখার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি সহজে ব্যবহারযোগ্য-

- সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহনকারী শিশু (৩৭ সপ্তাহের পূর্বে জন্মগ্রহনকারী শিশু)
- ঠিক সময়ে জন্মগ্রহনকারী স্বল্প ওজনসম্পন্ন (২৫০০ গ্রামের কম) শিশু
- সঠিক সময়ে জন্মগ্রহনকারী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি।

মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রথমত, একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরে শিশু ও মায়ের ত্বকের সংস্পর্শ

দ্বিতীয়ত, ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো।

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার পদ্ধতির উপকারিতাঃ-

শিশুর উপকারিতাঃ

১. শিশুর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে।

২. যে কোন ধরণের সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।

৩. এ সময় শিশুর অক্সিজেন সম্পৃক্তির হার বেশী থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে খুব দ্রুত স্বাভাবিক করে। Lundinton বলেছেন, ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের ফলে বাচ্চার হৃদপিন্ডের গতির হার, অক্সিজেন নেয়ার ক্ষমতা বেশী হয়। শিশু ভালো ঘুমায় এবং ব্রেইনের বিকাশ আরো ভালো হয়।

৪. মায়ের হৃদপিন্ডের গতির সাথে তাল মিলিয়ে শিশুর হৃদপিন্ডের গতি চলতে থাকে বলে 'Sudden infant death syndrome' হয় না। কারণ, নবজাতক অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যায়, যা ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে হয় না।

৫. বাচ্চার দেহের চর্বি ব্যবহার না হয়ে মায়ের শরীরের তাপ ব্যবহার করে বাচ্চা তার শরীরকে গরম রাখে বলে বাচ্চার ক্যালরি সংরক্ষিত হয়। তাই ওজন খুব দ্রুত বাড়তে থাকে।

৬. শিশুকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

৭. ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কে.এম.সি.) পাওয়া শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কে.এম.সি. না দেয়া শিশুদের চেয়ে খুব দ্রুত হয়। কারণ ত্বকের সাথে ত্বকের স্পর্শ হলে ভালোবাসার হরমোন অক্সিটোসিন বেশী নির্গত হয় যা শিশুকে উদ্বিগ্ন হওয়া, রেগে যাওয়া এবং হজম সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

৮. এটা বাচ্চার মানসিক চাপ এবং ব্যাথা কমায়। শুধু মাত্র ১০ মিনিট সময় ত্বকের সাথে সংস্পর্শে মানসিক চাপ কমানোর হরমোন Cortisol এবং Cuddle হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে শিশু শান্ত ও নিরাপদ থাকে।

৯. ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

১০. হাইপোথারমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, সেপসিস ইত্যাদি সম্ভাবনা হ্রাস পায়, ফলে শিশুর ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১১. শিশু মৃত্যুর হার এবং রোগ সংক্রমণ হ্রাস পায়।

১২. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ যেমন- নিউমোনিয়া, সর্দিকাশি, ব্রংকাইটিস; নসোকোমিয়াল ইনফেকশন (হাসপাতাল থেকে জীবাণুর সংক্রমণ) যেমন- নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ, রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ এবং শরীরের অন্যান্য অংশে যেমন- চামড়ায় বা ত্বকে জীবাণুর সংক্রমণ প্রবণতা হ্রাস পায়।

১৩. বাচ্চাকে সুন্দরভাবে ঘুমানোর অভ্যাস তৈরী করতে সহায়তা করে। Colic intervention অথবা শূলবেদনা বা পেট ব্যথা (অনেক সময় শিশু দিনে ৩ ঘন্টার বেশী, সপ্তাহে ৩ দিনের বেশী অথবা ৩ সপ্তাহের বেশী সময় ধরে কাঁদে যা প্রায় ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়) থেকে রক্ষা করে।

১৪. মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার চাহিদা বেড়ে যায় ফলে শিশুর দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পায়।

১৫. বাচ্চাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ উন্নত হয়।

১৬. বাচ্চাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতার মধ্যে স্থিতিশীলতা আসে এবং কোন মেশিনের সাহায্য ছাড়াই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল রাখার ক্ষমতা খুব দ্রুত তৈরী হয়।

১৭. অনেক সময় ইনকিউবেটরে বেশী stimulation এর কারণে বেশী অপরিণত শিশুর মস্তিষ্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার এর ফলে এমন একটি প্রাকৃতিক অবস্থা তৈরী হয় যা নবজাতকের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয় যেন মনে হয় প্রকৃত পক্ষে সে অপরিণত হয়ে জন্মায়নি।

১৮. একটি study তে দেখা গেছে, যেসব বাচ্চাকে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দেয়া হয় তারা গড়ে অন্য বাচ্চাদের তুলনায় ৬ মাসের বেশী সময় ধরে শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করতে পারে। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারে না থাকা বাচ্চাদের তুলনায় ক্যাঙ্গারু কেয়ারে থাকা বাচ্চারা ৩ মাসের বেশী সময় পযন্ত মায়ের দুধ পান করতে পারে।

১৯. কানাডার একটি গবেষনায় দেখা গেছে যে, ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার পাওয়া অপরিণত শিশুদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, ইনকিউবেটরে থাকা শিশুদের চেয়ে বেশী। বিশেষ করে, কৈশোরে তাদের ব্রেইনের কার্যকারিতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

মায়ের উপকারিতাঃ

১. এটা মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কারণ এটা দুধ তৈরীর হরমোন প্রোল্যাকটিন ও অক্সিটোসিন নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়।

২. মাকে শান্ত রাখে, মা হতাশায় ভোগে না ফলে মা শিশুর যত্ন ভালোভাবে নিতে পারে।

৩. গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার এবং মা-বাবার উদ্বিগ্নতার সীমার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মা-বাবার উদ্বিগ্নতার সীমার সাথে তাদের বয়স, পারিবারিক আয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান বাড়বে।

৪. মা-বাবার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার কখন শুরু করতে হয়?

প্রতিটি মা ও স্বল্প ওজনের শিশুর শারীরিক অবস্থা আলাদা আলাদা বিবেচনায় এনে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার শুরু করতে হবে।

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার প্রদানের ধাপঃ

প্রথম ধাপঃ ক্যাঙ্গারু অবস্থান

দ্বিতীয় ধাপঃ ক্যাঙ্গারু ফিডিং ও নিউট্রিশন পলিসি/ স্ট্র্যাটেজি (কতটুকু খাবে এবং কতবার খাবে)

তৃতীয় ধাপঃ

১. হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া
২. বাড়িতে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার প্রদানের ধাপসমূহের বর্ণনাঃ

প্রথম ধাপঃ ক্যাঙ্গারু অবস্থান

মায়ের ত্বকের সাথে শিশুর ত্বকের সংস্পর্শঃ

১। মায়ের বুকের মাঝে শিশুর বুক লাগিয়ে একটা কাপড় দিয়ে ধরে রাখতে হবে। শিশুর মাথা একপাশ কাত এবং সামান্য সোজা থাকবে। শিশুর এই অবস্থান শিশুর শ্বাসনালী খোলা রাখতে সাহায্য করে এবং শিশুর সাথে মায়ের দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করে। শিশুর মাথা উভয় দিকে বেশী নোয়ানো ও বেশী প্রসারিত করানো যাবে না। শিশুর কোমর স্বাভাবিক বাঁকানো এবং প্রসারিত থাকবে, ঠিক ব্যাঙ-এর মতো এবং হাত ও সামান্য বাঁকানো থাকবে।

২। যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় দিয়ে শিশুকে বাঁধতে হবে যাতে মা উঠে দাঁড়ালে শিশু পড়ে না যায়। কাপড়ের শক্ত অংশটি যেন শিশুর বুকের উপর না পড়ে সেটা নিশ্চিত হতে হবে।

৩। শিশুর পেট যেন ভাঁজ হয়ে না থাকে এবং মায়ের পেটের উপরিভাগে লাগানো থাকে। এই উপায়ে শিশু যথেষ্ট পরিমানে শ্বাস নিতে পারে। মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস শিশুকে উদ্দীপিত করে। শিশুকে বন্ধনীর ভিতরে ও বাইরে সরানোর পদ্ধতিঃ

- একটি হাত দিয়ে শিশুর ঘাড়ের পিছন এবং পিঠে ধরতে হবে।
- বৃদ্ধাঙ্গুল এবং অন্যান্য আঙ্গুল দিয়ে শিশুর মাথায় ধরতে হবে যাতে শিশুর মাথা পড়ে না যায় এবং শ্বাসনালী বন্ধ না হয়।
- অন্য হাতটি শিশুর কোমরের নিচে রাখতে হবে।

বিশেষভাবে লক্ষনীয়

১। শিশুর অবস্থান ঠিক করার পর শিশুর সাথে মা-কেও বিশ্রাম নিতে হবে। মা ও শিশুর সাথে থাকতে হবে এবং শিশুর অবস্থান পরীক্ষা করতে হবে। মাকে উৎসাহিত করতে হবে তিনি কিভাবে শিশুর খেয়াল রাখবেন এবং পাশাপাশি মাকে নড়াচড়া করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

২। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দেয়ার সময় কি কি অসুবিধা হতে পারে সেই দিকগুলো সম্পর্কেও মায়েদের অবগত করতে হবে। সে কিছুদিনের জন্য শিশুর সাথে জড়িয়ে থাকবে এবং এজন্য তার দৈনন্দিন কাজের অসুবিধা হবে সেই বিষয়গুলো জানাতে হবে। প্রথম দিকে ছোট শিশুরা বুকের দুধ ভালোভাবে খেতে পারে না। এই সময় মা বুকের দুধগুলো কাপ অথবা অন্য কোনভাবে শিশুকে খাওয়াতে পারেন; তবে এটি স্তনপান করানোর থেকে বেশী সময় নেয়।

৩। মা চিন্তিত থাকলে তাকে সাহায্য নেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং সবসময় তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, অন্য শিশুদের উন্নতির দিকগুলো দেখে বেশীরভাগ মা তার বাচ্চাদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দিতে চান। দীর্ঘ সময় ধরে মায়েরা একই ঘরে বসে একে অপরের সাথে তাদের জানা অজানা বিভিন্ন তথ্য, ইচ্ছা, আবেগ বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সমর্থন অর্জন করেন। কিছু সময় হতাশার পর তারা শিশুর এবং নিজের মাতৃত্ব সংক্রান্ত যত্নের ব্যাপারেও নিশ্চিত হন।

শিশুর ওজন	বয়স
জন্ম ওজন > ১৮০০ গ্রাম (গর্ভকালীন সময়ঃ ৩০-৩৪ সপ্তাহ বা তার বেশী)	বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মের পরপরই ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার শুরু করা যাবে শুধুমাত্র শারীরিক কোন জটিলতা না থাকলে।
জন্ম ওজন ১২০০-১৭০০ গ্রাম (গর্ভকালীন সময়ঃ ২৮-৩২ সপ্তাহ)	• এই ওজন নিয়ে জন্মগ্রহন কারী শিশুরা বিভিন্ন ধরণের জটিলতায় ভোগে। • তাই এ ধরণের শিশুদের মধ্যে যাদের রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে সাধারণত তাদের জন্মের ১ সপ্তাহ পর থেকে দেয়া হয়।
জন্ম ওজন < ১২০০ গ্রাম (গর্ভকালীন সময় ৩০ সপ্তাহ বা তার কম)	• এ ধরণের শিশুরাও বিভিন্ন জটিলতায় ভোগে ও মারাত্মক মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে। • তাই এদের মধ্যে যে সকল শিশুর অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং যাদের রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে তাদের সাধারণত জন্মের ১ সপ্তাহ পর থেকে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার শুরু করা যেতে পারে।

ডা. শাকিল তানভির
স্বাস্থ্য কর্মকর্তা,
বরগুনা।

অটিজম

অটিজম কি?

অটিজম এবং অটিজম স্পেকট্রাম ডিজওর্ডার- অটিজমের পরিধির অন্তর্ভূক্ত সমস্যাসমূহ) উভয়ই মস্তিষ্কের বিকাশজনিত এক শ্রেণীর জটিল সমস্যা। এই বিকাশ জনিত সমস্যাগুলোর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন: স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্কে অসুবিধা, কথার মাধ্যমে বা ইশারায় ভাব প্রকাশে অসুবিধা এবং একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা।

অটিস্টিক ডিজঅর্ডার, রেট সিন্ড্রোম, শৈশবে ক্রমহ্রাসমান বুদ্ধিমত্তা, পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এবং এ্যাসপারজার সিনড্রম বলতে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলোকেই বুঝায়। বয়স উপযোগী বোধগম্যতা/বুদ্ধিমত্তা, অঙ্গ সঞ্চালনে সমস্যা, মনোযোগের অভাব এবং শারীরিক সমস্যা যেমন- হজম ও নিদ্রাজনিত সমস্যা প্রভৃতিও অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার এর অন্তর্ভূক্ত। তবে এএসডি (অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার) আছে এমন ব্যক্তিদের কারো কারো দেখে মনে রাখা, গান, শিল্পকলা-ছবি আঁকা এবং গণিত বিষয়ে অত্যন্ত/চরম প্রখরতা থাকে।

মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশকালীন সময়ে অটিজমের সূচনা হতে পারে। তবে অটিজমের বেশীরভাগ লক্ষণসমূহ সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সেই শিশুদের মাঝে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কিছু কিছু দ্বিতীয় বছর পেরুনোর আগ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠে, কিন্তু এরপর তারা তাদের স্বাভাবিক বিকাশগত দক্ষতাগুলো হারিয়ে অটিজমের শিকার হয়- এই প্রবণতাকে রিগ্রেশন বলা হয়।

শুরুতেই অটিজম নির্ণয় করা গেলে ও অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি আচরণগত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হলে শিশুর সম্ভাব্য উন্নতি পাওয়া যায়। অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যরা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে।

অটিজমের বিস্তার কোন পর্যায়ে রয়েছে?

ইউ.এস. সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন এর জরিপ অনুযায়ী প্রতি ৮৮ জন আমেরিকান শিশুর মধ্যে ১ জনের অটিজম আছে এবং ৪০ বছরে প্রতিবছর ১০ গুণ হারে এর বৃদ্ধি ঘটেছে। গবেষণায় দেখা গেছে - উন্নত রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া ও গণ সচেতনতার মাধ্যমে অটিজম বৃদ্ধির হার বিষয়ক তথ্য সকলের নজরে এসেছে। গবেষণায় আরো জানা গেছে যে, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অটিজম হয়ে থাকে ৪ থেকে ৫ গুণ বেশী। আমেরিকায় ৫৪ জন ছেলের মধ্যে ১ জন এবং ২৫২ জন মেয়ের মধ্যে ১ জনের অটিজম হয়ে থাকে।

তুলনা করে দেখা গেছে, সম্মিলিত ভাবে যত শিশুর ডায়াবেটিস, এইডস, ক্যান্সার, সেরিব্রাল পালসি, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, মাসকুলার ডিসট্রফি এবং ডাউন সিন্ড্রম হয়ে থাকে তার চেয়ে অটিজমের এই সংখ্যা বেশী।

প্রতি বছর আমেরিকায় ২ মিলিয়ন লোকের মাঝে এএসডি (অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার) দেখা যায় এবং সারা বিশ্বে ১০ মিলিয়নের মত লোকের অটিজম হয়ে থাকে। তাছাড়া আমেরিকার সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই অটিজমের বিস্তার বার্ষিক ১০ থেকে ১৭ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য কোন কারণ ও ব্যাখ্যা জানা যায়নি। তবে ধারণা এরকম যে, উন্নত রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়ার অভাবে এবং পরিবেশগত প্রভাবই এজন্য দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কেন অটিজম হয়?

কিছুদিন আগেও এ সম্পর্কে গবেষকদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু গবেষণার ফলে বর্তমানে এ বিষয়ে কিছু উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন একক কারণে যেমন অটিজম হয় না তেমনি বিভিন্ন ধরণের অটিজম রয়েছে। গত ৫ বছরের গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা কিছু সংখ্যক বিরল জিনগত (জীবকোষ) পরিবর্তন বা মিউটেশন করেছেন যার সঙ্গে অটিজমের সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা অটিজমের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী ১০০ এর উপর জিন নির্ণয় করেছেন।

শতকরা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি অটিজমের জন্য নির্দিষ্ট জেনেটিক (বংশগত বৈশিষ্ট্য) প্রভাবের যোগাযোগ রয়েছে। বস্তুত, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের বিকাশকালীন সময়ে জটিল অটিজম সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় বলা যায়, অটিজমপ্রবণ বংশগত কারণ, কতিপয় বংশগতি নিরপেক্ষ এবং পরিবেশগত প্রভাব-শিশুর মাঝে অটিজম হবার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

শিশুর জন্ম পূর্ববর্তী এবং জন্মকালীন কোন বিশেষ ঘটনা পরিবেশগত ঝুঁকির অন্তর্ভূক্ত- যেমন: গর্ভধারণের সময় পিতামাতার অধিক বয়স, গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের কোন অসুস্থতা, জন্মলাভের স্বাভাবিক সময়ের অনেক আগেই শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া অথবা জন্মকালীন সময়ে অস্বাভাবিক কম ওজন, জন্মকালীন জটিলতা- যেমন জন্মের সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে কম অক্সিজেন সঞ্চালিত হওয়া প্রভৃতি। মায়েদের গর্ভকালীন সময়ে বায়ুদূষণ অথবা কীটনাশকের পরোক্ষ সংস্পর্শে আসাও শিশুর অটিজম হওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, এইসব এককভাবে অটিজম সৃষ্টি করে না বরং বংশগত উপাদান সমূহের সঙ্গে একত্রে মিশ্রিত হয়ে অধিক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। একটি ছোট পরিসরের কিন্তু ক্রমবিকাশমান গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুদের মায়েরা তাদের গর্ভধারণের পূর্বের এবং পরবর্তী মাস গুলিতে ভিটামিন (যাতে ফলিক এসিড রয়েছে) সেবন করেছেন সেই সব শিশুদের অটিজম আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। ক্রমবর্ধমানভাবে গবেষকরা অটিজমের উপর রোগপ্রতিরোধ প্রক্রিয়ার ভূমিকা নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

"অন দা স্পেকট্রাম (পরিসরের মধ্যে) বলতে কি বুঝায়"?

প্রতিটি অটিজম থাকা ব্যক্তির মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবে এএসডি (অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার) আছে এমন ব্যক্তিদের কারো কারো দেখে মনে রাখা, গান, শিল্পকলা, ছবি আঁকা এবং গণিত বিষয়ে অত্যন্ত/চরম প্রখরতা থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ৪০ শতাংশের বুদ্ধিমত্তা (আই.কিউ এর মাত্রা ৭০ এর নীচে) থাকে এবং অনেকের বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিক আবার কেউ কেউ অতি মেধাবী হয়। অটিজম স্পেকট্রামের অন্তর্ভূক্ত অনেক ব্যক্তি তাদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য গর্ব অনুভব করে কিন্তু বাকিরা অতিমাত্রার অক্ষমতার জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। প্রায় ২৫% অটিজম আছে এমন ব্যক্তিরা কথা বলতে পারেনা কিন্তু অন্যান্য উপায়ে তারা ভাব বিনিময়ের কৌশল শিখতে পারে।

অটিজমের জন্য কি টিকাকে (ভ্যাকসিন) দায়ী করা যায়?

অটিজমের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির পেছনে প্রতিষেধক টিকার কোন ভূমিকা আছে কি না তা নির্ধারণের জন্য অনেক গবেষণা করা হয়েছে। এসব গবেষণায় হাম, ম্যাম্পস এবং রুবেলা (এমএমআর) ভাইরাসের টিকা এবং যেসব টিকায় থিমেরাসাল সংরক্ষক (প্রিজারভেটিভ) রয়েছে সেগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে। তবে এসব গবেষণায় টিকার সঙ্গে অটিজমের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।
অভিভাবকেরা যাতে সন্তানদের টিকা প্রদান করেন সে জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি কারণ, এর ফলে শিশুরা মারাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে রক্ষা পাবে। প্রতিষেধক টিকা এবং বিদ্যমান বংশগত বা অন্যান্য অসুস্থতার সম্মিলিত প্রভাবে শিশুর অটিজম হবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থেকেই যায়।
বিশেষ করে যে সব বাবা-মার একজন সন্তান বা আত্মীয় ইতোমধ্যে অটিজমের শিকার হয়েছে তাদের মনে টিকার নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা থাকতেই পারে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের মধ্যে এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে আশঙ্কা রয়েই যায় তাই তাদের উচিৎ তাদের শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন করা। কোন শিশুকে সুস্থ রাখার একটি অন্যতম কৌশল হল এমন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ বা আস্থার সম্পর্ক তৈরী করা যিনি শিশুটিকে বা তার পরিবারকে জানেন।

আমি কিভাবে বুঝবো আমার সন্তানের অটিজম আছে কি না?

যদিও শিশুর বয়স ১৮ থেকে ২৪ মাস না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে অটিজম নির্ণয় করা যায় না, তবুও গবেষণায় ৮ থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুর মধ্যে অনেক সময় অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায়। অভিভাবকদের লক্ষ রাখতে হবে ৯ মাস বয়সের মধ্যে শিশুটি আধো বুলি (ব্যবলিং), হাসি বা নানা বকম মুখোভঙ্গী করে কি না? ১২ মাস বয়সের মধ্যে আধোবুলি (ব্যবলিং), হাত-পা দিয়ে শারীরিক কিছু ইঙ্গিত, ইশারা বা নির্দেশ (যেমন আঙ্গুল দিয়ে কিছু দেখান) করার প্রবণতা আছে কি না অথবা যে কোন বয়সে আধোবুলি, কথা বলার বা ইঙ্গিত করার সামর্থ্য এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে কি না।

আমার শিশুটির কোন সমস্যা হয়েছে এমন সন্দেহ হলে আমি করবো?

বিলম্ব না করেই তখনই একজন চিকিৎসক বা অটিজম বিষয়ক প্রাক-প্রাথমিক সেবাদানকারী সংস্থার কারো কাছে শিশুটিকে নিয়ে যান। যাতে শিশুটির সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। গবেষণায়

দেখা গেছে প্রাথমিক অবস্থার অটিজম নির্ণয় করতে ও ব্যবস্থা নিতে পারলে অটিজমের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াগুলো অনেক সফলভাবে মোকাবেলা করা যায়।

আমার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কিভাবে পাবো?

প্রাথমিক ভাবে অটিজম নির্ণয়ের পাশাপাশি একজন উপযুক্ত এই বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন চিকিৎসক ও সেবাদানকারী দলের সহায়তা নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অটিজম সম্পর্কে জানেন, বোঝেন এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, মানসিক রোগ চিকিৎসক এবং শিক্ষক খুঁজে বের করুন যাতে তারা শিশুর পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলি সঠিকভাবে পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

আমার অটিজম আছে এমন সন্দেহ দেখা দিলে কি করবো?

অ্যাসপারজার সিন্ড্রম (Asperger Syndrome) অথ বা অন্য কোন উচ্চ ক্রিয়াশীল এএসডি (অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার) আছে এমন অনেকেরই তাদের শৈশবে অটিজম আছে কি না তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কেউ কেউ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে পেশাগত বা সামাজিক সম্পর্ক জনিত সমস্যায় পড়লে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এজন্যই চিকিৎসকের কাজে একজন অটিজম বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সন্ধান জরুরী।
চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত যে সব ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্কদের অটিজম নির্ণয়ের যোগ্যতা রাখেন তারা হলেন লাইসেন্সধারী ক্লিনিকাল মনোবিজ্ঞানী, নিউরোলজিস্ট এবং মনোরোগ চিকিৎসক। কিছু পেশাজীবী নার্স, সমাজকর্মী এবং মাস্টার্স পর্যায়ের মনোবিজ্ঞানীদেরও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অটিজম নির্ণয়ের যোগ্যতা আছে।

আমি অটিজম রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া কিভাবে মোকাবেলা করবো?

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অটিজম নির্ণিত হওয়া তাদের সারা জীবনের বিড়ম্বনার একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। অভিভাবকগণ যখন প্রথম আবিষ্কার করেন তাদের সন্তানের মাঝে স্বাভাবিক বিকাশগত অসুবিধা রয়েছে তখন থেকে পরবর্তী কয়েক মাস তাদের মধ্যে ভাবাবেগ ও বিভ্রান্তি বিরাজ করতে পারে এবং পরিস্থিতিকে বিরূপ মনে হতে পারে। তবে সন্তানের এরূপ অবস্থার জন্য অভিভাবকদের নিজেদের দায়ী করা উচিত নয়। এর পরের ধাপ হল অটিজম সম্পর্কে নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। এ বিষয়ে জানাটাই আপনার শক্তি এবং আপনি অটিজম সম্পর্কে যত জানবেন ততই সঠিকভাবে আপনার সন্তানকে সহযোগিতা করতে পারবেন।

সেইসাথে অভিভাবকদেরও কিছুটা বিশ্রাম নেয়া ও বিরতি জরুরী, কেননা অটিজম থাকা শিশুদের সাথে কাজের জটিলতায় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আপনি যদি অনুভব করেন সন্তানের এই অটিজম থাকার বিষয়টি আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে তাহলে আপনি একজন কাউন্সেলর বা থেরাপিস্ট এর সাহায্য নিতে পারেন। আপনি এককভাবে এ সমস্যার মোকাবেলা করতে পারবেন এমনটা আশা করা যায় না।

আমার সন্তান কি স্কুলে যেতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারবে। এটা তার জন্মগত অধিকার। আমেরিকান সরকার 'ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ ডিজএবিলিটিস এ্যাক্ট ১৯৯০' অনুযায়ী সেখানকার শিশুদের বিনা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের জন্য শিক্ষা অথবা নিয়মিত অথবা বিশেষ বিদ্যালয় এই উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে।

অটিজম
দ্রুত ব্যবস্থা নিন
দ্রুত সনাক্ত করুন
১। অটিজম কোন রোগ নয়, মস্তিষ্কের একটি বিকাশজনিত সমস্যা, যার ফলে শিশু অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না এবং একই কাজ বা আচরণ বার বার করে থাকে।
২। শিশুর মধ্যে এই সমস্যাগুলো কম বা বেশী মাত্রায় থাকতে পারে।
৩। দ্রুত সনাক্ত করা ও যথোপযোগী ব্যবস্থা নিলে এই শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মত উন্নতি করতে পারে।
গ্লোবাল অটিজম - বাংলাদেশ
ACTION FOR AUTISM

জওশন আরা রহমান

উপদেষ্টা, গ্রামীণ ট্রাস্ট
সদস্য, গ্রামীণ-শিক্ষা পরিচালনা পরিষদ ও গণবিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড
ইউনিসেফের প্রোগ্রাম প্ল্যানিং সেকশন প্রধান।
কনসালটেন্সি হিসেবে বর্তমানে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত আছেন।

সুধী পাঠক,

স্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা "আমার স্বাস্থ্য"-এর গত সংখ্যায় (আগস্ট ২০১৮) গুনীজন পর্বে প্রকাশিত হয় গুনী ব্যক্তিত্ব জওশন আরা রহমানের একটি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে কিছু ভুল তথ্য প্রকাশ করা হয় যার জন্য "আমার স্বাস্থ্য" ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নিচে প্রকাশিত তথ্য এবং তার সংশোধনী ছাপানো :

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা: ৬৪

স্বামী ছিলেন একজন দেশপ্রেমী, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, কবি এবং সাহিত্যিক জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী। তার লেখা বিখ্যাত কবিতা **"কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি"** ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধায় লেখা প্রথম কবিতা। এমন সক্রিয় দেশপ্রেমীর জীবনসঙ্গী হিসাবে তিনিও জড়িয়ে ছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের সৈনিক হিসাবে, ছিলেন ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়, পেয়েছেন "মুক্তিযোদ্ধা" আর "ভাষা কন্যা" উপাধিও।

যখন কাজ করেছেন আর্ন্তজাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে, তখনও দলের প্রধান হয়েও কাজ করেছেন দলের একজন হিসেবে কারণ তিনি জানতেন তিনি একজন নারী আর তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়াটা তৎকালীন পুরুষসমাজের জন্য খুব স্বাভাবিক ছিল না।

সংশোধিত সংবাদ পৃষ্ঠা: ৬৪

ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি ভাষাকন্যা বা মুক্তিযোদ্ধা এ ধরনের কোন উপাধি লাভ করেনি। তিনি প্রথমে ইউনিসেফের ওমেন ডেভেলপমেন্ট বিভাগ এবং পরবর্তীতে প্রোগ্রাম পানিং সেকশনের প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে কাজ করেন নি।

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা: ৬৯

কর্মজীবনে পুরুষ সহকর্মীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কর্মক্ষেত্র শুরু হয়েছিল সমাজ কল্যাণ অফিসার হিসাবে।

সংশোধিত সংবাদ পৃষ্ঠা: ৬৯

তিনি ১৯৬০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সমাজ কল্যান বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম জেলার আরবান কমিউনিটি ডেভেলাপম্যান্ট প্রজেক্টে একজন অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। তারও বেশ ক'মাস পূর্বে চট্টগ্রাম মিউনিসিপিলিটিতে শহর সমাজ কল্যান অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা: ৭১

১৯৫৩ সালে গনতান্ত্রিক পার্টি গঠিত হলে জওশন আরার স্বামী একুশের প্রথম কবিতার জনক কবি মাহবুবুর আলম চৌধুরী ১৯৫৩ সালে গনতান্ত্রিক পার্টি গঠিত হলে তিনি তার (গনতান্ত্রিক পার্টির) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে নিবাচিত হন।

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্লাস্টিককে ‘না’ বলি এবং পাটকে ‘হাঁ’ বলি

স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। একথা পুরোনো হলেও চিরন্তন সত্য। মহান আলাহ এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত করে এবং মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন এই ধরনীতে জীবন-যাপন করার জন্য। এই সুন্দর পৃথিবীতে যাতে আমাদের জীবন ধারনে কোনরূপ সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ দান করে রেখেছেন। পৃথিবী চলছে তার আপন নিয়মে। সমগ্র পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য একটি সুন্দর ইকো সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে।

আমাদের নিজেদের জীবন রক্ষার স্বার্থেই আমাদের দায়িত্ব, পরিবেশের এই ভারসাম্য যাতে কোনভাবে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। নয়তো এই পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তলিয়ে যাবে। পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখতে আমাদের কিঞ্চিত ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে, না হলে আমাদের অচিরেই বিশাল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।
পলিথিন বা পাস্টিক একটি নিত্যব্যবহার্য পণ্য। কিন্তু পলিথিনের যথেষ্ট ব্যবহারের কারনে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এই অপচনশীল পণ্যের লাগামহীন ব্যবহার পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ও পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে। এর ফলশ্রুতিতে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে জনস্বাস্থ্য।

প্রতিদিন প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য খাল-বিল, নদী-নালা থেকে শুরু করে মহাসমুদ্র পর্যন্ত প্লাস্টিক পদার্থ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। উন্নত বিশ্বের প্রসিদ্ধ কোম্পানীর বোতলজাত পানিতেও মিলছে বিষাক্ত প্লাস্টিক কণা। পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে বিশ্বের সকল স্তরের জীববৈচিত্র্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। হুমকির মুখে পড়ছে অনুজীব

জুটের তৈরি ব্যাগ

থেকে শুরু করে তিমি মাছ পর্যন্ত। প্লাস্টিক বন্ধের লক্ষ্যে জনমত গড়ার জন্য ইতোপুর্বে সারা বিশ্বে ধরিত্রী দিবস পালিত হয়েছে 'প্লাস্টিক বাজার সমাপ্তি' প্রতিপাদ্যে। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে ১৯৭০ সাল থেকে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস' পালিত হয়ে আসছে।

আমাদের দেশে ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধে আইন প্রনয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এর কার্যকারিতা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

রাজধানীসহ সারা দেশে প্রায় ১২০০ কারখানায় নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরী হচ্ছে। এগুলো বেশির ভাগ কারখানা পুরান ঢাকাতে। এছাড়া বর্তমানে ৩৫ লাখের বেশি টিস্যু ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে। এসব ব্যাগ পলিথিনের তৈরী হলেও কাপড়ের ব্যাগ বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. কামরুজ্জামান মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্লাস্টিক শুধু আসবাবপত্র বা পলিথিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে নামিদামি কসমেটিক কোম্পানীর সাবান, ফেসওয়াশ, টুথপেস্ট, বডিওয়াশ, ডিটারজেন্ট ইত্যাদিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মোড়কে মাইক্রোবিড নামক ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার উপস্থিতি দেখা যায়। এগুলো ব্যবহারের পর নদী-নালা, খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে পতিত হচ্ছে এবং মাছের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে প্লাস্টিক ও পলিথিনের দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। গ্রামে-গঞ্জে জমির উর্বরতা শক্তি ও পানিপ্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করছে এই পলিথিন। পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের পর রাস্তাঘাট, ড্রেনসহ যত্রতত্র ফেলে রাখার জন্য তা পানি, বায়ুসহ সমগ্র পরিবেশকে দূষিত করছে।

এ সকল প্লাস্টিক পুকুর, নদী-নালায় দীর্ঘদিন ধরে থাকলে তা জলজ প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি কোন না কোনভাবে পরিবেশ দূষিত করছে। আবার, মাছের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্লাস্টিক কণা প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্লাস্টিক পাত্রে দীর্ঘদিন খাবার বা পানীয় সংরক্ষণ করলে সেসব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে ওঠে। প্লাস্টিক অপচনশীল হওয়ায় এর বিষক্রিয়ায় শরীরে নানা রকম জটিলতা

দেখা দিতে পারে। আবার প্লাস্টিক পণ্য পোড়ানো হলেও তা থেকে সৃষ্ট দূষিত গ্যাস বা বায়ু মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব তৈরী করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, শরীরে প্লাস্টিকের বিষক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, বিভিন্ন হরমোনাল সমস্যাসহ ক্যান্সার, নবজাতকের জন্মগত রোগ ইত্যাদি মারাত্মক অসুখও হতে পারে।

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর পলিথিনের এই বিপজ্জনক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হয়েও আমরা নির্বিকার! আমাদের সামান্য সুবিধার জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর পলিথিন অহরহ ব্যবহার করছি। বাজারে গেলে দেখা যায় প্রকাশ্যেই পলিথিন ব্যাগ নিয়ন্ত্রনহীনভাবে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশাসন যেন দেখেও দেখছে না। অথচ রপ্তানী ছাড়া সকল ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ।

পলিথিন ব্যাগের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্য পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের জন্য আমরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছি। পাট পরিবেশের জন্য শতভাগ নিরাপদ এবং এটি বারবার ব্যবহারযোগ্য, তাই সাশ্রয়ীও বটে। পাটের আঁশ থেকে 'সেলুলোজ' আলাদা করে তার পলিমার তৈরী করা হয়। পলিমারের তৈরী ব্যাগ দেখতে পলিথিনের মত হলেও এটি পরিবেশবান্ধব। এই পলিমারের তৈরী ব্যাগ ফেলে দিলে তা পঁচে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। পচনশীল হলেও এই ব্যাগের মধ্যে পানি বা বাতাস প্রবেশ করতে পারে না।

তাই আসুন আমাদের জীবন ও পরিবেশ রক্ষার্থে আমরা পাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হই। পাস্টিকের তৈরী দ্রব্যাদি যেমন- ফেসওয়াশ, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহারের পর যত্রতত্র না ফেলে আমরা রিসাইক্লিং করলে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে অনেকাংশে। আর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এর বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের চেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব পণ্য আর হতে পারে না।

আর এ লক্ষ্যেই আমার 'উই জুট' এর সাথে সম্পৃক্ততা। তাই 'উই জুট' এর পক্ষ হতে আমি বলতে চাই যে, দেশ ও দশের স্বার্থে আমরা সবাই এক হই এবং সর্বসম্মতিক্রমে পলিথিনকে বয়কট করি আর পাটের ব্যাগকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্যসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করি।

আইভি খান ওয়াহিদ
পরিচালক, উইজুট

WE JUTE

www.wejutebd.com

404, Golam Rasul Plaza, 1st Floor (A-4), Dilu Road, New Eskaton, Dhaka.
email: info@wejutebd.com, 01926677541

সম্মানিত জাতীয় অধ্যাপক,
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপকবৃন্দ,
অবসরপ্রাপ্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূত,
সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ও দেশের
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসিত, প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন
স্বীকৃত প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ, দেশের প্রতি যাদের
দায়বদ্ধতা আছে তাঁরা তাঁদের সমৃদ্ধ কর্মজীবনের
অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে
share করবেন ।

- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- দেশের কর্পোরেট সেক্টর এর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গদের সান্নিধ্যে আনানো হবে, তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য।
- সর্বোপরি একজন যোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা out of the box-এর ভিত্তিতে প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীদের গড়ে তোলা হবে।

Center for Dexterity Development Program
(A sister concern of Happy Home and Healthcare Prokashoni)
Unique Trade Centre, Ground Floor
Update College (Padma and Jamuna Hall)
8, Panthapath, Dhaka
Phone : 01748 348621

- পৃথিবীর সব প্রতিষ্ঠিত এবং স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণ করে, তাদের অধ্যাপকবৃন্দ/শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে সে অনুযায়ী conduct করা হবে।
- শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থা থাকবে।

কোর্স চলবেঃ-
রোববার থেকে বৃহস্পতিবার

- প্রতি কার্যদিবসঃ বিকাল ০২.১৫ থেকে রাত ০৯.১৫ পর্যন্ত
- প্রতিটি ক্লাশ হবে ৭৫ মিনিট ব্যাপী
- রেজিস্ট্রেশন অনলাইনেঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত
- ক্লাশ শুরুঃ ৩ মার্চ, ২০১৯

অরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধন প্রোগ্রাম: ২ মার্চ ২০১৯, শনিবার সকাল: ১০.০০টা। সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

Touching lives
every day, every moment
Transcom